তমাল বলল— থাকার কাজ ছাড়াও তো গাছ মানুষের নানা প্রয়োজনে লাগে।

—হ্যাঁ। কোনো গাছ থেকে ঔষধ পাই। আবার কোনো গাছ থেকে খাবার পাই। গাছের নামে কতো জায়গার নাম হয়। হিংস্র পশুদের থেকে বাঁচার জন্য গাছের শক্ত ডাল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত।

এবার আলোচনা করে এমন পাঁচটি গাছের নাম বলো যাদের ডাল খুব শক্ত।

১। ..... ২। ..... ৩। .....

৪। ..... ৫। .....

দিদিমণি বললেন — কৃষিকাজ শেখার পর গাছের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেল। মানুষ গম, যব, ধানের বীজ জমিয়ে রাখতে শিখল। নানা গাছের চারা পুঁতে তাদের বাঁচিয়ে রাখার ভাবনাও এল।

রীতার দাদুর সেবার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। ডাক্তারজেঠু ওনাকে তেতো ট্যাবলেট খেতে দিলেন। রীতা ডাক্তারজেঠুর কাছ থেকে জানল— এই জ্বর সারানোর ওষুধ নাকি কোনো একটা গাছের ছাল থেকে তৈরি হয়। এরকম অনেক গাছ আছে যাদের মূল, কাণ্ড বা পাতা ওষুধ তৈরির কাজে লাগে।

এবার তোমরা বন্ধুদের, শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটি করো।

| গাছের নাম | মানুষের জীবনে কী কী কাজে লাগে |
|---|---|
| ধান | |
| বাঁশ | |
| পাট | |
| তুলসী | |

# পোষ মানা পশু- পাখি

রুমা, সহেলি ও আফসানারা খরগোশ পুষেছে। রোজ তাদের কচি ঘাস এনে খাওয়ায়, যত্ন করে। অরুণের একটা ছোটো কুকুর আছে। স্কুলে এসে সেসব নিয়ে ওদের গল্প হচ্ছিল।

রুমা বলল— আগেকার মানুষও কি আমাদের মতো পশু-পাখি পুষত, তাদের যত্ন করত?

দিদিমণি বললেন— আগেকার মানুষ প্রথমেই পশুকে পোষ মানাতে পারেনি। তারা শিকার করে পশুর মাংস খেত।

রীনা জিজ্ঞেস করল— কী কী জন্তু শিকার করত?

দিদিমণি বললেন— এক এক জায়গায় এক এক রকমের পশু শিকার করত। কোথাও লোমওয়ালা হাতি। কোথাও আবার বলগা হরিণ। কোথাও বা আবার বুনো শুয়োর।

অরুণ জিজ্ঞাসা করল— তাহলে জন্তুকে পোষ মানাল কেন?

— মানুষ বুঝতে পেরেছিল পশুকে পোষ মানালে অনেক সুবিধা। সারা বছর ধরে মাংস, দুধ আর চামড়া পাওয়া যাবে। তবে কুকুরকে এসবের জন্য পোষ মানানো হয়নি, হয়েছিল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ।

এবার তোমরা বিভিন্ন পশু কী কী কাজে লাগে তা লেখো।

| কুকুর | ছাগল | গোরু | ঘোড়া |
|---|---|---|---|
| | | | |

আফসানা বলল --- মানুষ পাখিকে কেন পোষ মানাল?

--- হাঁস, মুরগির মতো পাখিদের

পোষ মানিয়েছিল সারা বছর ধরে ডিম ও মাংস পাবার জন্য। তবে অনেক পাখিকে মানুষ নিজের অন্য প্রয়োজনেও ব্যবহার করত। পায়রাকে খবর দেওয়া-নেওয়ার কাজে ব্যবহার করত।

এসব শুনে জন বলল— দিদি, তাহলে পশুপাখি ছাড়া মানুষের চলত না, বলুন?

দিদিমণি বললেন— মানুষের জীবনে পশুপাখিদের গুরুত্ব আস্তে আস্তে বেড়েছিল। তখন মানুষ তাদের দলের চিহ্ন হিসেবে পশুপাখির ছবি বা মূর্তি ব্যবহার করত। কোথাও সিংহ, বাঘ, ভালুক, ষাঁড়, হরিণ। আবার কোথাও নেকড়ে, বাজপাখি বা শকুন।

— পশুপাখিদের নিয়ে মানুষ অনেক কিছু করেছে। কিন্তু গল্প কি লেখেনি?

দিদিমণি বললেন —হ্যাঁ। কত গল্পই না লিখেছে। নানা লোককথা, উপকথায় এরকম নানা পশুপাখির কথা বলা হয়েছে।

# যন্ত্রের নানা কাজ

এসো নীচের ছবিগুলি দেখো। ওই ছবিগুলির মধ্যে কোনগুলি তোমাদের বাড়িতে রোজ ব্যবহার হয় — তা লেখো।

টিউবওয়েল

তালাচাবি

ঘড়ি

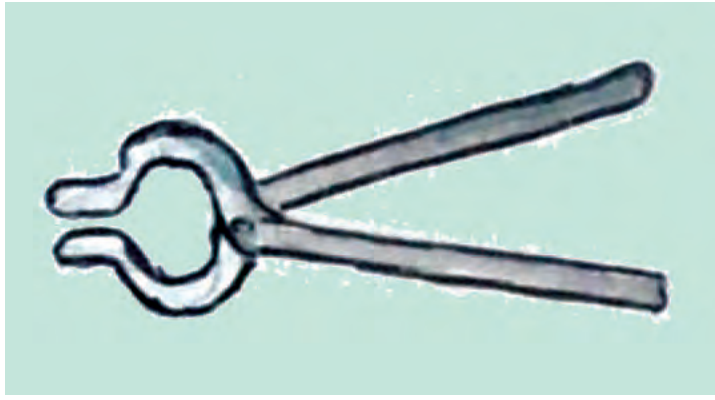

সাঁড়াশি

স্টোভ

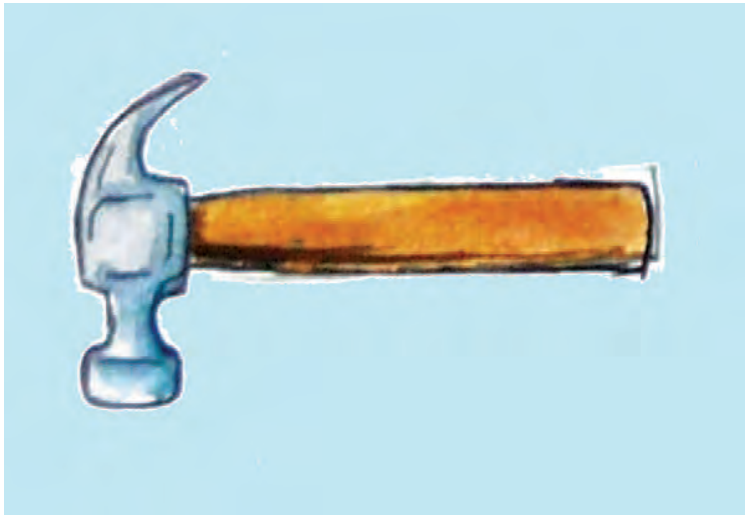

হাতুড়ি

কোদাল

ছুঁচ

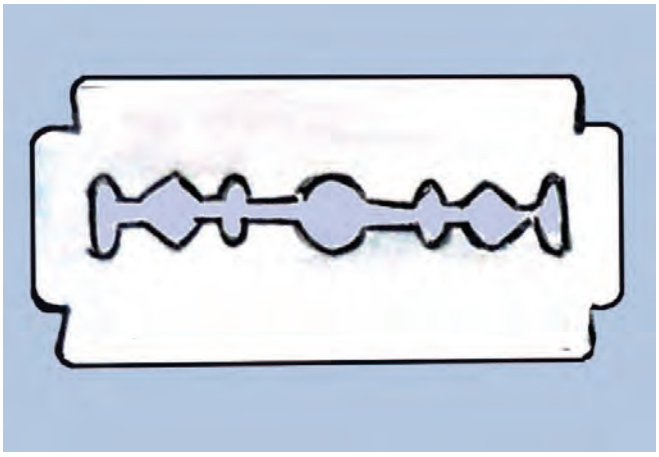

ব্লেড

ছুরি

| কোন কোন যন্ত্র তোমাদের বাড়িতে ব্যবহার হয় | কোন কোন কাজে ব্যবহার হয় |
|---|---|
| | |

তিমির বলল— আচ্ছা বাড়ির বাইরেও তো আমরা নানাধরনের যন্ত্রকে কাজে লাগাই।

দিদিমণি বললেন—ধরো খুব উঁচু গাছের মগডালে একটা আম ঝুলছে। তোমরা সেটা পাড়তে চাও। কীভাবে পাড়বে?

অরুণ বলল — বাপ্পা তো ঢিল ছুঁড়ে পেড়ে ফেলবে। ওর হাতের দারুণ টিপ।

দিদিমণি বাপ্পাকে ডাকলেন। বললেন — হাতের টিপ থাকা ভালো। কিন্তু ঢিল ছুঁড়ে ফল পাড়া ঠিক নয়। ফসকে গিয়ে ঢিল কারো মাথায় পড়তে পারে। কেউ জখম হতে পারে।

রানি বলল — সব থেকে ভালো আঁকশি বা লগি দিয়ে পেড়ে নেওয়া।

দিদিমণি বললেন — আমাদের যদি জিরাফের মতো লম্বা গলা থাকত। তাহলে আর লগি, আঁকশি, ঢিল কিছুই লাগত না।

সুভাষ বলল — বানরের মতো লাফ দিয়ে গাছে চড়তে পারলেও মিটে যেত। গাছে গাছে ঘুরে মগডালের ফল খেয়ে বেড়াতাম।

দিদিমণি বললেন — এই যে দেখো। মানুষের জিরাফের মতো লম্বা গলা নেই। আবার বানরের মতো লাফাতেও পারে না মানুষ। অথচ গাছের মগডালের ফল পেড়ে নিতে পারে।

সালাম বলল — মানুষের যে বুদ্ধি আছে দিদি। বানর, জিরাফের থেকে মানুষের বুদ্ধি যে অনেক বেশি।

দিদিমণি বললেন — হ্যাঁ। ঠিক তাই। বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ কঠিন কাজ সহজে করে নেয়। নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারে। সেই যন্ত্রপাতিকে ইংরাজিতে বলে Tool (টুল)। সেইসব টুল দিয়ে অনেক কাজ সহজেই করে ফেলতে পারে মানুষ। যেমন, লগি বা আঁকশি একটা টুল। তা দিয়ে গাছে না উঠেই সহজে ফল পেড়ে নেওয়া যায়।

রাবেয়া বলল — এমন তো অনেক টুল আছে দিদি। রোজ আমরা এমন অনেক কাজ করি টুল দিয়ে।

সালাম বলল — টিনের কৌটোর ঢাকনা সহজে খোলা যায় না। চামচের হাতল দিয়ে ঢাকনার ধারে চাপ দিলে খুলে যায়। তাহলে চামচও একটা টুল?

দিদিমণি বললেন — হ্যাঁ তো। রোজ দিন এমন অনেক টুল নানা কাজে আমরা ব্যবহার করি।

সুভাষ বলল — আচ্ছা দিদি, টুলগুলো কী দিয়ে তৈরি হতো?

পরিমল বলল — কেন দেখিসনি লোহা, স্টিল এসব দিয়েই তো তৈরি হয়।

রাবেয়া বলল — তবে কাঠ দিয়েও বানানো হয় অনেক কিছু। যেমন, আঁকশির কথাই ধর না।

দিদিমণি বললেন — সবসময় এসব দিয়েই যে মানুষ টুল বানাত তা নয়। খুব পুরোনো দিনে পাথর দিয়ে টুল বানাত মানুষ। কারণ তখন তারা কেবল পাথরের ব্যবহারই জানত। তাছাড়া পশুর হাড় দিয়েও কিছু টুল বানাত।

যেমন, ধরো ছুঁচ। তোমরা তো স্টিলের ছুঁচ দেখো। মানুষ অনেক দিন আগে পশুর হাড় দিয়ে ছুঁচ বানাত।

অরুণ বলল — হাতিয়ারও কি পাথর দিয়ে বানাত, দিদি?

দিদিমণি বললেন — হ্যাঁ। প্রথমে ভোঁতা বড়ো পাথরই ছিল মানুষের হাতিয়ার। তারপর নানাভাবে পাথরকে হালকা, ছুঁচালো ও ধারালো করে নিত তারা। সেই পাথরই ছিল মানুষের প্রথম হাতিয়ার। তার অনেক পরে ধাতুর ব্যবহার শেখে মানুষ। ধাতু মানে তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা এইসব।

ফুলমণি বলল — হাতিয়ারও কী টুল, দিদি?

দিদিমণি বললেন — না, টুল হলো ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি। আর হাতিয়ার হলো অস্ত্রশস্ত্র। হাতিয়ার দিয়ে পশুদের থেকে নিজেকে বাঁচাত মানুষ।

সুভাষ বলল — আমরাও তো তাহলে নানরকম টুল ব্যবহার করি দিদি।

দিদিমণি বললেন — করিই তো। রোজ নানা কাজে নানারকম টুল ব্যবহার করি। তাতে শ্রম ও সময় দুইই বাঁচে। সেই পুরোনো দিন থেকেই মানুষ টুল ব্যবহার করত। তাতে কম সময়ে সহজে নানা কাজ করা যেত। তারপর থেকে নানাভাবে টুলের উন্নতি করেছে মানুষ।

এবার আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সকল টুল ব্যবহার করি তার কোনটা কী দিয়ে বানানো হয় এসো তা লেখার চেষ্টা করি।

| ক্রমিক নং | টুল | কী দিয়ে তৈরি | কী কাজে লাগে |
|---|---|---|---|
| ১। | চামচ | | |
| ২। | কোদাল | | |
| ৩। | লগি/আঁকশি | | |
| ৪। | সাঁড়াশি | | |
| ৫। | হামানদিস্তা | | |
| ৬। | কাঁচি | | |

# পাথরের ব্যবহার

রঞ্জুর কাছে নানারকম পাথর আছে। ও পাথর জমাতে ভালোবাসে। একদিন ক্লাসে সবাইকে পাথরগুলো দেখাতে নিয়ে গেল। দিদিমণিও দেখলেন।

দিদিমণি বললেন— পাথর মানুষের নানা কাজে লাগে।

অঞ্জু বলল— পাথর দিয়ে শিলনোড়া তৈরি হয়।

মানিক বলল— রেললাইনে পাথর দেয়, দেখিসনি?

পলাশ বলল— মূর্তি বানায় পাথর দিয়ে।

ওদের আলোচনা শুনে দিদিমণি বললেন — মানুষ গুহাতে থাকার সময় থেকেই পাথর ব্যবহার করত। হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়াইতে চারপাশে পড়ে থাকা পাথরই ছিল তাদের হাতিয়ার।

আফতাব বলল — কীভাবে পাথরের হাতিয়ার তৈরি করত?

— পাথর ভেঙে তৈরি মোটামুটি তিনকোনা আকৃতির টুকরো দিয়ে তৈরি করত হাতকুঠার। আবার পাথরের ধারালো টুকরো দিয়ে মাংস থেকে চামড়া ছাড়ানো হতো। পাথরের তৈরি তির বা বর্শার ফলা শিকার করতে সাহায্য করত। আস্তে আস্তে পাথরের হাতিয়ার আরো হালকা ও ধারালো করা হলো।

সোমা বলল — হাতিয়ার তৈরি করা ছাড়া আর কোনো কাজে লাগত না পাথর?

— হ্যাঁ, আগুন জ্বালাতে চকমকি পাথর লাগত। দুটো চকমকি পাথরে ঘষা লাগলে আগুনের ফুলকি তৈরি হয়।

অঞ্জু বলল – দিদি, আমারও রঙিন পাথর কুড়োতে খুব ভালো লাগে।

দিদিমণি বললেন — এরকম নানা রঙের সুন্দর পাথরের টুকরো দিয়ে পুরোনো দিনের মানুষ পাথরের তৈরি মালা ব্যবহার করত। আজও আমরা নানাভাবে পাথরের ব্যবহার করি। তাছাড়া ঘরবাড়ি বানাতেও পাথরের ব্যবহার হতো।

এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তোমরা নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

| পুরোনো দিনের মানুষ কীভাবে পাথর ব্যবহার করত | এখনকার মানুষ কীভাবে পাথর ব্যবহার করে |
|---|---|
| | |

# ধাতুর ব্যবহার

রেহানা বলল— তাহলে লোহার ব্যবহার করতে মানুষ কখন শিখল?

দিদিমণি বললেন — সে তো শিখেছে অনেক পরে। তবে আগে তামার ব্যবহার শিখেছিল। তামা, লোহা, কাঁসা সবই ধাতু। বলোতো ধাতু আলাদা করে চেনা যায় কীভাবে?

রুকসানা বলল — কিছু দিয়ে পিটলে 'ঠং ঠং' করে আওয়াজ হয়।

দিদিমণি বললেন — ঠিক, আর কোনো উপায় আছে ধাতুদের চেনার?

সুনীল বলল — হ্যাঁ, বেশ চকচক করে, আর গরম করলে খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়।

দিদিমণি বললেন — তাই বুঝি? তুমি জানলে কী করে?

সুনীল বলল — চায়ের কেটলি বা রুটি সেঁকার চাটু উনুনে বসাবার একটু পরেই গরম হয়ে যায়।

নীচে বিভিন্ন ধাতুর নাম লেখা আছে। এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ফাঁকা স্থান পূরণ করো।

| ধাতুর নাম | চারপাশে দেখা ধাতুর তৈরি জিনিসের নাম | কী কাজে লাগে |
|---|---|---|
| সোনা | | |
| তামা | | |
| লোহা | | |
| কাঁসা | | |
| পিতল | | |
| অ্যালুমিনিয়াম | | |
| স্টেনলেস স্টিল | | |
| রুপো | | |

দিদিমণি বললেন— মানুষের প্রথম কাজের ধাতু হলো তামা। আজ থেকে অনেক আগে মানুষ প্রকৃতিতে তামা খুঁজে পায়। তখনও কিন্তু লোহার ব্যবহার জানা ছিল না। অ্যালুমিনিয়াম, পিতল, স্টেনলেস স্টিলের কথা তখনও অজানা।

রুবী প্রশ্ন করল— তামা কী খুব শক্ত ধাতু?

— শক্ত ঠিকই কিন্তু লোহার মতো শক্ত নয়। প্রকৃতিতে যে তামা পাওয়া যেত তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মানুষ খুব দরকারি দুটো জিনিস তৈরি করেছিল। তার একটা হলো লাঙল আর অন্যটা হলো কাস্তে। তামা দিয়ে বাসনপত্র, কাস্তে তৈরি করা সম্ভব, কিন্তু ঢাল - তরোয়াল বা ভারী কাজের যন্ত্র কিছুই তামা দিয়ে করা যাবে না।

অরুণ জানতে চাইল— লোহা এল কবে?

দিদিমণি বললেন — প্রথমে লোহাকে পায়নি। লোহার আগে তৈরি করেছিল ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জ হলো তামা আর টিনের মিশ্রণ। ব্রোঞ্জ তামার চেয়ে শক্ত, অথচ তামার চেয়ে সহজে গলে যায়। এতে মানুষের চাষের যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্র তৈরির খুব সুবিধে হলো। আমাদের দেশেরও পুরোনো দিনের তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি গয়না, খেলনা ও মূর্তি পাওয়া গেছে। এরপর একসময় মানুষ পৃথিবীতে এসে পড়া উল্কাখণ্ড থেকেই লোহাকে খুঁজে পায়।

ক্লাসের সবার জানার ইচ্ছে হলো— লোহার জিনিসের কী কী সুবিধে?

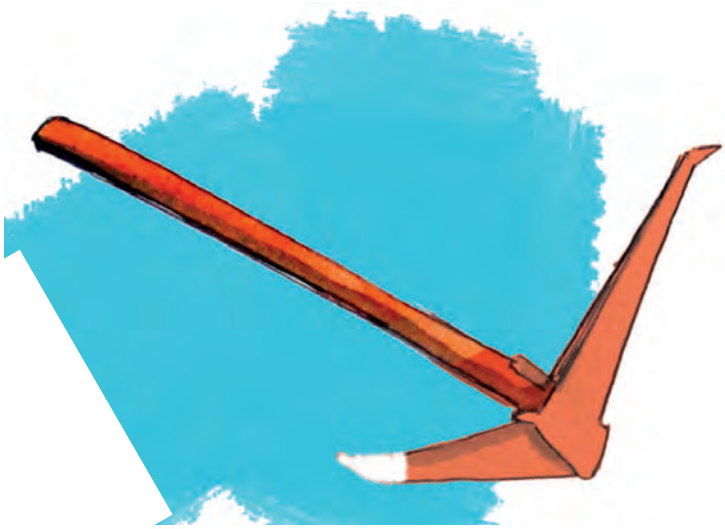

দিদিমণি বললেন --- লোহার জিনিস শক্ত, ব্রোঞ্জের চেয়ে ধারালো করা যায়। বহুদিন ধরে

ধার থাকে। এতে মানুষের নানান কাজে খুব সুবিধে হলো। চাষের জমি আরও বাড়ল, জঙ্গল কেটে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে লাগল।

রুমা বলল— কিন্তু আমাদের হাঁড়ি-কড়া-থালা-বাটি সেগুলো তো লোহা বা তামার তৈরি নয়?

দিদিমণি বললেন— লোহার অনেক গুণ আছে ঠিকই। কিন্তু লোহার একটা মস্ত অসুবিধে হলো তাতে মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। অ্যালুমিনিয়াম বা স্টেনলেস স্টিলে মরচে ধরে না। গলানো লোহার সঙ্গে কিছু কিছু পদার্থ মিশিয়ে তৈরি হয় নানারকম ইস্পাত। বাড়ি, ব্রিজ, যানবাহন তৈরিতে, কৃষিকাজে, নানা যন্ত্রপাতি তৈরিতে ইস্পাত কাজে লাগে। যদিও আমরা সাধারণ কথায় বলি, লোহার রড, আসলে কিন্তু ওগুলো ইস্পাতের তৈরি।

# নীচের ছবিতে ইস্পাতের তৈরি নানা জিনিসগুলোকে চিনে পাশে লেখো।

১

২

৩

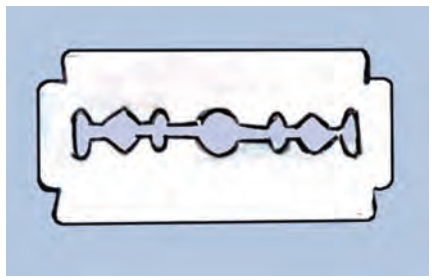

৪

৫

১। _____।

২। _____।

৩। _____।

৪। _____।

৫। _____।

# প্রতিদিনের কাজে চাকা

ডমরুর আজ স্কুলে ঢুকতে একটু দেরি হলো। ওর সাইকেলের চাকায় টাল হয়েছিল। সারাতে সময় লাগল।

দিদিমণি রাগ করলেন না। বললেন, মাঝেমধ্যে এরকম হতে পারে। কিন্তু চাকা ছাড়া তো গাড়ি চলবেই না। চাকা তো আমাদের বন্ধু।

দিদিমণি আরও বললেন— চাকা আমাদের প্রতিদিনের নানা কাজে লাগে।

আনোয়ার বলল — মানুষ কীভাবে চাকা তৈরি করা শিখল?

— মানুষ এক দিনে হঠাৎ করে চাকা তৈরি করতে পারেনি। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে চাকা তৈরি করেছে।

সুজয় বলল — কী ধরনের প্রয়োজন?

দিদিমণি বললেন— কোনো কিছু টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া ছিল কঠিন।

পলাশ বলল— চাকার ব্যবহার জানলেই কি সব কাজ সহজে করতে পারত মানুষ?

রাবেয়া বলল— তাহলে চাকার ভাবনা কীভাবে এল মানুষের মাথায়?

দিদিমণি বললেন— এটা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। হয়তো পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়তে দেখেছিল। তার থেকে মাথায় এসেছিল চাকার ধারণা।

নীচের ছবি দুটি ভালো করে দেখো। বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে লেখো।

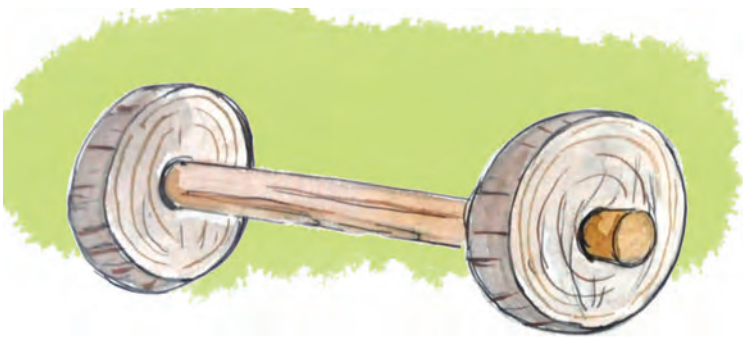

প্রথম ছবি

দ্বিতীয় ছবি

| চাকার বিষয় | প্রথম ছবি | দ্বিতীয় ছবি |
|---|---|---|
| ১। ওজন | | |
| ২। সুবিধা | | |
| ৩। অসুবিধা | | |

রানি বলল— প্রথমে কী দিয়ে চাকা বানাত মানুষ?

দিদিমণি বললেন— প্রথমে কাঠ দিয়েই চাকা বানাত। গাছের গুঁড়ি গোল করে কেটে চাকা তৈরি করত। তারপর পাথরের চাকাও হতো।

তিতির বলল — দিদি, কাঠের চাকা ভেঙে যেত না?

দিদিমণি বললেন — হ্যাঁ। ভেঙে যেত। পচেও যেত। একসময় মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখল। এরপর চাকাকে শক্তপোক্ত

করার জন্য লোহার বেড় দিয়েছিল।

ডমরু জিজ্ঞেস করল — বাসে, মোটরেতে রাবারের টায়ার লাগায় দিদি?

— রাবারের চাকা তৈরি হওয়া শুরু হলো অনেক পরে। তাতে হাওয়া ভরা হলো। এতে চাকা হালকা হলো। ঝাঁকুনি কমল। গাড়ি তাড়াতাড়ি চলতেও শুরু করল।

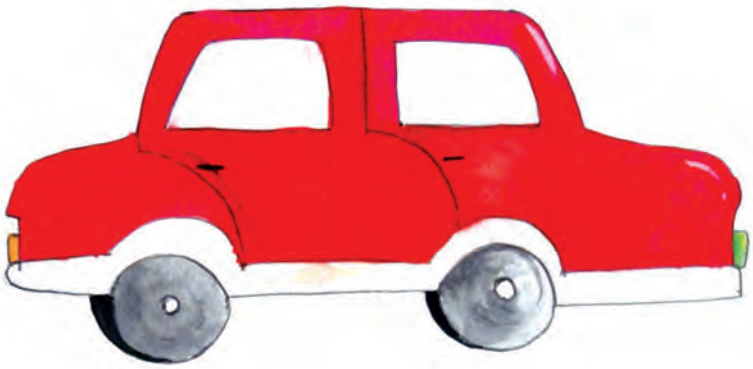

# কত কাজেই না লাগে লাঠি

## নীচের ছবিগুলো ভালোভাবে লক্ষ করো:

## ছবিগুলো দেখে লাঠি কী কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে নীচে লেখো:

| ছবি নং | লাঠি কী কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে? |
|---|---|
| ১ | |
| ২ | |
| ৩ | কুয়ো থেকে জল তোলার কাজে (অনেক আগে দড়ির বদলে লাঠি ব্যবহার করা হতো) |
| ৪ | |
| ৫ | |
| ৬ | |
| ৭ | সহজে ভারী জিনিস তোলার কাজে |
| ৮ | আত্মরক্ষার জন্য লাঠির ব্যবহার: সুরক্ষার জন্য লাঠি ব্যবহার করা হয় |
| ৯ | |
| ১০ | |

ছবিগুলো দেখে রনিতা, দীপ, ঝিলাম আর আলম অনেকগুলো চিনতে পারল। আর বাকিগুলোর কথা দিদিমণির কাছ থেকে জানতে চাইল।

দিদিমণি বললেন --- আজ থেকে অনেক বছর আগে মানুষ বনে-জঙ্গলে বাস করত। তখন থেকেই হাতিয়ার হিসাবে গাছের ডাল, লাঠি ব্যবহার করত। তারপর আরো নানারকম কাজেই লাঠির ব্যবহার হয়। ভারী জিনিস তোলার কাজেও লাঠির ব্যবহার তোমরা দেখতে পাবে। ধাতু আবিষ্কারের পর লাঠির মাথায় পাথরের বদলে ধাতুর ফলা জুড়ে বর্শা তৈরি শুরু হয় ।

তোমাদের জানা আর কোন কোন কাজে লাঠি ব্যবহার করা হয়, আলোচনা করে লেখো :

| কাজের নাম | কীভাবে ওই কাজে লাঠির ব্যবহার হবে |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

দীপ বলল — দিদি, এসব কাজে লাঠির মতোই আর কিছু ব্যবহার করা যায় না, যেটা লাঠির চেয়ে মজবুত ও টেকসই হবে?

— লাঠির মতোই ব্যবহার করার জন্য এখন তৈরি হয়েছে ধাতুর রড। এভাবেই আরও মজবুত ও টেকসই জিনিসপত্র নিজেদের প্রয়োজনে তৈরি করে নিয়েছে মানুষ।

# আগুন থেকে সাবধান

পুজোর ছুটির পর স্কুল খুলেছে। অমিত স্কুলে আসেনি। বাজি ফাটাতে গিয়ে ওর হাত পুড়ে গেছে।

দিদিমণি বললেন — বাজি, পটকা এসব দাহ্য বস্তু সাবধানে নাড়াচাড়া করা উচিত।

সোহম দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করল — দিদি দাহ্য বস্তু কী?

দিদিমণি বললেন — যেগুলিতে আগুন লাগলে সহজেই জ্বলে ওঠে ও অল্প সময়ে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। দহন মানে পোড়া। সেই থেকেই এসেছে দাহ্য কথাটা।

মানসী বলল — খড়, শুকনো পাতা, বিচালি, কেরোসিন, পেট্রোল, বাজি তৈরির মশলা এগুলো তো দাহ্য বস্তু;

বাড়ির বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে তোমাদের বাড়িতে যে যে দাহ্য বস্তু আছে তার নাম নীচে লিখে ফেলো।

| বর্তমানে আমাদের ঘরে থাকা দাহ্য বস্তু | কেমন সাবধানতা নিলে আগুন লাগা এড়ানো যায় |
|---|---|
| ১. | ১. |
| ২. | ২. |
| ৩. রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার | ৩. ঘরে ঢুকে রান্নার গ্যাসের গন্ধ পেলে কোনো আলো জ্বালাবে বা নেভাবে না। সমস্ত দরজা-জানালা খুলে দিতে হবে। গ্যাসের নব বন্ধ আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। গ্যাস পরিষেবার লোককে খবর দিতে হবে। |
| ৪. কেরোসিন তেল | ৪. জ্বলন্ত স্টোভে কখনই তেল ভরবে না বা পাম্প দেওয়া স্টোভে অতিরিক্ত পাম্প করবে না। |
| ৫. | ৫. |
| ৬. | ৬. |
| ৭. | ৭. |
| ৮. পেট্রোল | ৮. |

# চারপাশের পড়ে থাকা আবর্জনা

দিদিমণি বললেন— পাশের ছবিটা ভালো করে দেখো। আমাদের ফেলে দেওয়া জিনিস সম্বন্ধে তোমাদের কী ধারণা হচ্ছে।

করিম বলল— দিদি ছবিটাতে বেশ কিছু নোংরা জিনিস পড়ে রয়েছে। সঙ্গে প্লাস্টিকও আছে।

দিদিমণি বললেন--- তোমরা ঠিকই ধরেছ। এই নোংরাগুলোকেই বর্জ্য পদার্থ বলা হয়। বর্জন করা বা ফেলে দেওয়া হয় বলে এগুলোর নাম বর্জ্য। তোমরা দেখবে কিছু বর্জ্য পদার্থ জমিয়ে রাখলে যেমন কাগজ, আনাজের খোসা প্রভৃতি পচে দুর্গন্ধ বেরোয়। আবার কিছু বর্জ্য পদার্থ মাটিতে মিশে যায় না। যেমন– প্লাস্টিকের বোতল, কাচের টুকরো, প্লাস্টিকের প্যাকেট, টিনের কৌটো।

এবার তুমি উপরের ছবিটি দেখো। বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে নীচে লেখো। প্রয়োজনে বাড়ির বড়োদের সাহায্য নাও।

| বর্জ্য পদার্থের ধরন | কী ধরনের বর্জ্য মাটিতে মেশে / মেশে না | কোথায় দেখেছ | ওই বর্জ্য জমিয়ে রাখলে কী ক্ষতি | কীভাবে এই বর্জ্য পদার্থকে সরিয়ে ফেলা উচিত |
|---|---|---|---|---|
| ১.তরকারির খোসা | | ১. বাড়ি/মিড-ডে মিলের রান্নাঘরে | | ১. ডাস্টবিনে ফেলা উচিত |
| ২. | | | | |
| ৩. | | | | |
| ৪. | | | | |
| ৫. | | | | |

# সাপের কামড় থেকে সাবধান

মিনু ক্লাসে ঢুকে দিদিমণিকে বলল— কাল আমাদের পাড়ায় একজনকে সাপে কামড়েছে। সবাই বলল খুব বিষাক্ত সাপ। বিষাক্ত মানে কী দিদি?

দিদিমণি বললেন--- আসলে সাপের দাঁতের নীচে বিষথলিতে বিষ থাকে। তারা নিজেদের বাঁচাতে মানুষকে কামড়ায়। তখন কামড়ানোর জায়গায় ওই বিষ ঢেলে দেয়। এরকম জিনিস শরীরে প্রবেশ করলেই জ্বালা, যন্ত্রণা শুরু হয়। কয়েক মুহূর্ত পরেই ওই স্থান ফুলেও ওঠে। সাপের মতো অনেক প্রাণীর দাঁতের নীচে বা হুলে বিষ থাকে। এরা সবাই বিষাক্ত প্রাণী।

পরের দিন দিদিমণি ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটা ছবি দেখালেন। বিষাক্ত সাপে কামড়ালে কী করতে হবে তার সম্পর্কে কিছু ছবি দেখালেন। তারপর বললেন ছবিগুলো দেখে তার বিষয়বস্তু ডানদিকে লেখো।

দিদিমণি বললেন — বিষাক্ত সাপে কামড়ালে সময়মতো চিকিৎসা না হলে মানুষ মারাও যেতে পারে। এসো দেখি সাপে কামড়ালে আমরা কী করতে পারি।

| | |
|---|---|
| ১. ক্ষতস্থানে বিষদাঁত লেগে থাকলে তা হালকাভাবে তুলে ফেলা। ক্ষতস্থান জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলা দরকার। | |

২. হাতের বাহুতে / পায়ের উরু অংশে দড়ি হালকা করে বাঁধতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে প্রতি এক দেড় ঘণ্টা পরে বাঁধন খুলে আবার যেন হালকা ভাবে বাঁধা হয়।

৩. সময় নষ্ট না করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া।

৪. রোগী যাতে ভয় না পায় সেই বিষয়ে সাহস দেওয়া।

৫. বমি করতে চাইলে বমি করতে দেওয়া।

৬. শ্বাসকষ্ট হলে মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাস দেওয়া।

# রোগ সারাতে গাছ

তুতাই ক্লাসে এসে দিদিমণিকে বলল— টুকাই আজ স্কুলে আসবে না।

দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন— কেন?

তুতাই বলল— কাল খেলার সময় ওর পায়ে খুব জোর লেগেছে। সকালে ওর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম ওর পা ফুলে গেছে। ওর মা টুকাইয়ের পায়ে চুন-হলুদ গরম করে লাগিয়ে দিয়েছেন।

চম্পা বলল— আমার গলা ব্যথা হলে মা আমাকে বাসকপাতা, মিছরি, গোলমরিচ জলে ফুটিয়ে গরম জলটা খেতে দেন।

দিদিমণি সব কথা শুনে বললেন— কিছু দিন আগে আমার পায়ে এমন লেগেছিল যে পা ফেলতেই পারছিলাম না। আমার দিদি কোথা থেকে রাংচিতার ডাল নিয়ে এলেন। তারপর ওই ডাল থেঁতো করে আগুনে গরম করলেন।

তারপর গরম গরম রস ব্যথার জায়গায় লাগিয়ে দিলেন। দু-দিন এইভাবে করলাম। তারপর দেখি ব্যথা অনেক কমে গেছে।

নীচের রোগগুলির জন্য প্রাথমিকভাবে কোন কোন ধরনের গাছপালা ব্যবহার করা হয় বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে তা লিখে ফেলো।

| কী ধরনের শরীর খারাপ | কোন ধরনের গাছপালা ব্যবহার করা হয় | কীভাবে ব্যবহার করা হয় |
|---|---|---|
| ১। সর্দি ও কাশি | | |
| ২। জ্বর | | |
| ৩। আঘাত লেগে ব্যথা | | |
| ৪। কেটে গেলে | | |
| ৫। পেটের অসুখ সারাতে | | |

পরেরদিন স্কুলে দিদিমণি জানতে চাইলেন গাছপালা ব্যবহার সম্পর্কে তালিকাতে কী লেখা হয়েছে। তারপর এসব বিষয়ে অনেক আলোচনা হলো।

# খুঁজব গাছ, সারাব রোগ

পরের দিন ক্লাসে দিদিমণি ছাত্রছাত্রীদের বললেন— তোমরা জানলে আমাদের চারপাশের নানা গাছ আমাদের রোগ সারাতে পারে। এসব উদ্ভিদকে ভেষজ উদ্ভিদ বলা হয়।

ডোডো দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করল— দিদি মানুষ কবে বুঝল যে গাছপালাও রোগ সারাতে সাহায্য করে?

দিদিমণি বললেন— সে অনেক আগের কথা। মানুষ তখন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। শাকপাতা ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকত। সেইসময় থেকেই শরীর খারাপ হলে গাছপালা ও তার শিকড়বাকড় খেয়ে রোগ সারাত।

শেখর দিদিমণিকে বলল— আমার দাদু একদিন বাবার সঙ্গে গাছপালা ও ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

দিদিমণি বললেন— তোমার দাদু ঠিকই বলেছিলেন। এমন

কোনো গাছ প্রায় নেই যার কোনো ভেষজ গুণ নেই। তাই গাছপালা চেনাটা আমাদের কাছে খুব জরুরি।

নীচের তালিকাতে কিছু ভেষজ গাছের ছবি দেওয়া হলো। ওই গাছগুলি তোমার এলাকা থেকে জোগাড় করার চেষ্টা করো। ওই গাছগুলির কোন অংশ রোগ প্রতিকারের জন্য কীভাবে ব্যবহার করা হয় বাড়ির বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লিখে ফেলো।

| ভেষজ গাছের ছবি | ওই গাছের কোন অংশ ব্যবহার করা হয় | কোন রোগ সারাতে ব্যবহার করা হয় | কীভাবে ব্যবহার করা হয় |
|---|---|---|---|
| তুলসী | | | |
| নয়নতারা | | | |

| ভেষজ গাছের ছবি | ওই গাছের কোন অংশ ব্যবহার করা হয় | কোন রোগ সারাতে ব্যবহার করা হয় | কীভাবে ব্যবহার করা হয় |
|---|---|---|---|
| কালমেঘ | | | |
| থানকুনি | | | |
| কুলেখাড়া | | | |

# এলাকার গাছ, ওষুধ বারোমাস

করিম দিদিমণিকে বলল— দিদি, আমাদের এলাকায় একটা বড়ো অর্জুন গাছ আছে। অনেক লোক গাছের ছাল নিয়ে যায়। ওনাদের জিজ্ঞাসা করলে বলেন ওই গাছের ছাল জলে ভিজিয়ে খেলে নাকি হার্টের অসুখ সেরে যায়।

বিমল কবিরাজ বললেন— অর্জুন গাছ কেন, এরকম অনেক গাছ আছে, যার নানা অংশ নানা রোগ সারাতে ব্যবহার করে থাকেন।

বিভিন্ন রোগে ব্যবহার করা হয় এমন গাছপালা জোগাড় করো। তার ছবি আঁকো। নীচে লেখো।

| গাছপালা | কোন অংশ ব্যবহার করা হয় | কীভাবে ব্যবহার করা হয় | কেন ব্যবহার করা হয় |
|---|---|---|---|
| সিঙ্কোনা | গাছের ছাল থেকে | তেতো ট্যাবলেট | কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলে সারাতে |
| নিম | | | |

| গাছপালা | কোন অংশ ব্যবহার করা হয় | কীভাবে ব্যবহার করা হয় | কেন ব্যবহার করা হয় |
|---|---|---|---|
| পেঁপে | | | |
| আমলকি | | | |
| জাম | | | |
| শিউলি | | | |
| শুশনিশাক | | | |
| কলমিশাক | | | |

## হারিয়ে যাওয়া ভেষজ গাছের খোঁজে

দিদিমণি কাজের শেষে ছাত্রছাত্রীদের বললেন— আমরা তো অনেক গাছ নিয়েই আলোচনা করলাম। তাছাড়াও তোমার এলাকায় নানাধরনের গাছপালা আছে বা ছিল। যেগুলি অতীতে মানুষ বিভিন্ন রোগ প্রতিকারের জন্য সরাসরি ব্যবহার করত। এমন কিছু গাছের নাম লেখো,

যেগুলি আগে তোমার এলাকায় প্রচুর পাওয়া যেত। এখন আর পাওয়া যায় না। যদিও বা পাওয়া যায় তা সংখ্যায় হয়তো অনেক কম।

বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করো। না পাওয়ার বা সংখ্যায় কমে যাওয়ার কারণ উল্লেখ করো।

| গাছপালার নাম | তোমার এলাকায় এখনও কি প্রচুর পাওয়া যায়/যায় না | না পাওয়া বা সংখ্যায় কমে যাওয়ার কারণটি উল্লেখ করো |
|---|---|---|
| ১। | | |
| ২। | | |
| ৩। | | |
| ৪। | | |
| ৫। | | |

| গাছপালার নাম | তোমার এলাকায় এখনও কি প্রচুর পাওয়া যায়/যায় না | না পাওয়া বা সংখ্যায় কমে যাওয়ার কারণটি উল্লেখ করো |
|---|---|---|
| ৬। | | |
| ৭। | | |
| ৮। | | |
| ৯। | | |
| ১০। | | |

আমরুল পাতার রস
রক্ত আমাশাকে করে বশ।

# পাহাড় অঞ্চলে মানুষের জীবিকা

রোশনদের পরিবার দার্জিলিং-এ থাকে। পাহাড় ছেড়ে সমতলে চলে এসেছে। রোশনের বাবা ওখানে চা-পাতা তৈরির কারখানায় কাজ করেন। রোশন রহমতকে জিজ্ঞাসা করল— তোর বাবা কী করেন?

রহমত বলল— আমার বাবা দিঘা থেকে কম দামে কাজুবাদাম কিনে এনে শহরে বেশি দামে বিক্রি করেন। তাতেই আমাদের সংসার চলে।

দিদিমণি বললেন— নানান অঞ্চলে নানা ধরনের জীবিকা তোমরা দেখতে পাবে। আবার চাষ করা বা মাছ ধরার মতো জীবিকা নানা অঞ্চলে দেখা যায়। কে কোথায় থাকেন তার ওপর জীবিকার ধরন অনেকটাই নির্ভর করে।

রীনা বলল— ঠিক বুঝলাম না দিদি।

— আমাদের রাজ্যে ভূভাগটা সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও উঁচু পাহাড়, কোথাও মালভূমি। আবার কোথাও শুধু চাষের জমি। এছাড়াও আছে নদী, সমুদ্র, জঙ্গল।

দিদিমণি রোশনকে জিজ্ঞেস করলেন— তুমি দার্জিলিং-এ যখন থাকতে তখন চা-পাতা তৈরির কারখানা ছাড়া আর কোথায় কোথায় কী কী কাজ করতে মানুষকে দেখেছ?

রোশন বলল— দার্জিলিং বেশ ঠাণ্ডা জায়গা। টয় ট্রেনে বা জিপে চড়ে কত মানুষ বেড়াতে আসেন। স্থানীয় মানুষ গাড়িতে করে ওদের ঘোরান। হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। খাবার বা শীতের পোশাক ওইসব পর্যটকদের বিক্রি করেন। এছাড়াও অনেকে হাতের তৈরি জিনিসও

ম্যালের আশেপাশের রাস্তার ধারে বিক্রি করেন। জঙ্গলের কাঠ থেকে নানা আসবাব ও প্যাকিং বাক্স তৈরির কাজও বহু মানুষ করেন।

— তবে কি পাহাড়ে চাষ হয় না?

— ধান, স্কোয়াশের চাষ হয়। ফুল চাষ হয়। আর হয় কমলালেবু, নাসপাতির মতো ফল।

দিদিমণি বললেন— উঁচু-নীচু ভূমিভাগ হওয়ায় ফসল চাষ ভালোভাবে করা যায় না। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চাষবাস করতে হয়। এছাড়াও ওখানের স্কুল, কলেজে পড়ানো, অফিসের কাজ আর ব্যাবসা করা অনেকের জীবিকা।

# কত জায়গায় কত রকম জীবিকা

নীচের ছবিগুলিতে কে কী কাজ করছেন তা ছবির নীচে লেখো।

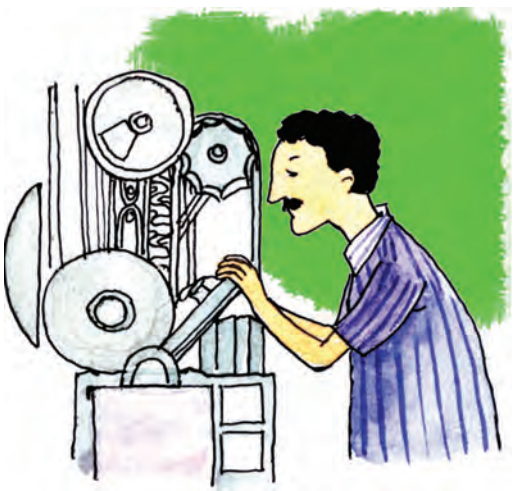

অসিত বলল— বাবা বলেন, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বহু মানুষ পাথরের খাদানে কাজ করেন।

জাহাঙ্গির বলল— একবার ট্রেনে যেতে যেতে রানিগঞ্জে কয়লাখনির কথা আমি শুনেছিলাম।

— শুধু রানিগঞ্জ কেন? বর্ধমান জেলার আরও অনেক জায়গায় কয়লা তোলা হয়। এ কাজে বহু মানুষ কাজ করে জীবিকা চালান। আর এই কয়লাকে ব্যবহার করেই গড়ে উঠেছে নানা কলকারখানা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এতেও অনেকে কাজ করেন। পাহাড় ও মালভূমির অংশটুকু বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের বাকি প্রায় সব অংশই সমভূমি বা নীচু জলা জায়গা। এসব জায়গার মানুষ কৃষিকাজ, মাছধরা, ব্যাবসা করা বা নানা অফিসে চাকরি করেন।

রুমা বলল— জঙ্গলের আশেপাশে যারা থাকেন তাদের তো অফিসে চাকরি বা চাষের কাজ করার সুবিধে নেই। তবে তাদের জীবিকা কী?

মণীশ বলল— জলপাইগুড়িতে জঙ্গলের পাশে আমার মামার বাড়ি। ওখানকার লোকেরা জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করেন। কেউ কেউ কাঠ চেরাইয়ের কলেও কাজ করেন।

— জঙ্গল থেকে শুধু যে কাঠ পাওয়া যায় তা নয়। মধু, পাতা, গাছের ঔষধি অংশ সংগ্রহ করেন জঙ্গল এলাকার মানুষ। এছাড়াও মাছ ধরা, চিংড়ির মীন সংগ্রহ বা নৌকো তৈরিকেও অনেকে নিজেদের জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

এবার তোমরা নীচের তালিকাটি তোমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বা বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

| কোন অঞ্চল | জীবিকার নাম |
|---|---|
| (১) চাষ জমির আশেপাশে | |
| (২) খনি এলাকায় | |
| (৩) ঘন জঙ্গলের পাশে | |
| (৪) নদী বা সমুদ্রের আশেপাশে | |

# নানারকম হাতের কাজ ও জীবিকা

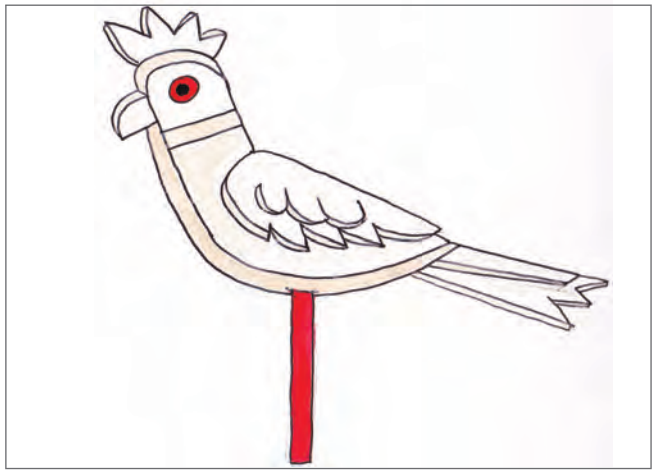

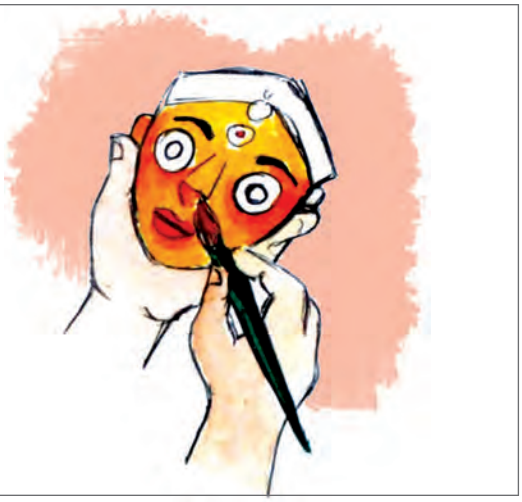

ওপরের ছবিগুলো কীসের ছবি তা ফাঁকা জায়গাগুলোতে লেখো।

## পুতুল তৈরি

গল্পের বইতে বিশু তালপাতার সেপাইয়ের কথা পড়েছে। বিশু একদিন স্যারকে জিজ্ঞেস করল তালপাতার সেপাই মানে কী? স্যার যা বললেন তাতে বোঝা গেল— বাচ্চাদের জন্য বানানো তালপাতার একধরনের পুতুল। আগে সব মেলাতেই

পাওয়া যেত। পুতুলের পায়ের নীচে কাঠি। কাঠি দু-হাতে ঘোরালেই টুপি পরা সেপাই হাত পা ছুঁড়তে থাকে। খুব মজাদার! কিন্তু এখন আর এসব পুতুল তত পাওয়া যায় না! পটুয়ারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তৈরি করে নানান জিনিসের পুতুল। মনসা ঘট, লক্ষ্মীর পট, রঙিন ছবি আঁকা হাঁড়ি, কলশি এসবও তৈরি করেন কুম্ভকারেরা।

## নকশি কাঁথা

কমলিকা অনেকক্ষণ এসব কথা শুনছিল। বলল— আমাদের বাড়িতে পুরানো ট্রাঙ্কের মধ্যে ঠাকুমার মা-র বানানো নকশি কাঁথা দেখেছি। সামান্য শাড়ি, ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বাংলার মেয়েরা বানাতেন নকশা করা কাঁথা। কাঁথার গায়ে গল্পকথা, বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া এসব সূঁচ-সুতোয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

## মাটির কাজ

রহমতের বাবা কাঁচা মাটি দিয়ে বাড়ি তৈরি করেন। কৃষ্ণনগরের কিছু মানুষ ওই মাটি দিয়ে পুতুল বা প্রতিমা তৈরি করেন। শুধু কাঁচা মাটি নয়, মাটি পুড়িয়েও নানা জিনিস তৈরি হয়। পোড়া মাটি দিয়ে তৈরি হয় এমন চারটি জিনিসের নাম লেখো।

১। _____ ২। _____ ৩। _____

৪। _____

দিদিমণি বললেন — ঘর তৈরির পর ঘর সাজাতে বা প্রতিদিনের কাজে টুকিটাকি কত জিনিসের দরকার হয়। তোমরা এরকম কয়েকটা জিনিসের নাম বলতে পারো?

কুসুম বলল — সরা, কুলো, ঝুড়ি।

সোহরাব বলল — হাতপাখা, চাটাই, আসন, পাপোশ — এরকম কত কী!

এবার তোমরা নীচের তালিকার জিনিসগুলো কী কী দিয়ে তৈরি তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

| জিনিসের নাম | কী দিয়ে তৈরি | তোমার অঞ্চলে এর কোনগুলো তৈরি হয় |
|---|---|---|
| ১. নৌকো | | |
| ২. মাদুর | | |
| ৩. চিরুনি | | |
| ৪. হাতপাখা | | |
| ৫. ঝাড়ু | | |
| ৬. ঘুনি | | |
| ৭. দড়ি | | |
| ৮. শাড়ি | | |
| ৯. গরম জামাকাপড় | | |

## বাঁশের কাজ

মুকুলের বাঁশির আওয়াজ শুনে পাড়ার সবাই ওর বাঁশিটা নেড়েচেড়ে দেখে। জলপাইগুড়ির এক গ্রামীণ মেলা থেকে কিনে এনেছিলেন ওর বাবা। মেলায় নাকি শুধু বাঁশ আর বেতের তৈরি জিনিসের ছড়াছড়ি। ঠাকুমার ফুলের সাজি, কাকার ছিপ আর মার কুলো — সবই ওই মেলা থেকে কেনা। বাঁশ ও বেতকে ব্যবহার করে আর কী কী জিনিস তৈরি হতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

| বাঁশের তৈরি জিনিস | বেতের তৈরি জিনিস |
|---|---|
| | |

## সুবলদের কদম ফুল

শ্বেতা আর কস্তুরী নববর্ষে দোকানে সারি সারি কদম ফুল টাঙানো দেখল। খোঁজ নিয়ে ওরা জানল, এগুলো শোলার তৈরি। বন্ধু সুবলদের বাড়িতে নাকি তৈরি হয়।

সুবলকে জিজ্ঞাসা করায় ও বলল — শোলা দিয়ে বাবা চাঁদমালা আর টোপর তৈরি করেন। দেবদেবীর প্রতিমাও তৈরি হয়।

— শোলার কাজ যারা করেন কোথাও কোথাও তাদের মালাকার বলা হয়।

শোলা দিয়ে তৈরি তোমার চেনাজানা পাঁচটি জিনিসের নাম লিখে ফেলো।

১। _____ ২। _____ ৩। _____

৪। _____ ৫। _____।

## মুখোশ

সহেলি মামার বাড়ি থেকে কালকে ফিরেছে। আজ স্কুলে এসেছে। বলল চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসবে ওরা প্রতি বছর পুরুলিয়ায় মামার বাড়ি যায়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলাগুলোতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গাজনের মেলায় ছৌ নাচ হয়।

সহেলি বলল— রামায়ণ-মহাভারতের মতো গল্প দিয়ে তৈরি হয় ছৌ নাচের কাহিনি। ছৌ নাচে মুখোশ পরতেই হয়।

বিশু বলল— এই মুখোশগুলো বানায় কারা?

স্যার বললেন— পুরুলিয়া জেলার জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে আছে ছৌ নাচের মুখোশ বানানোর শিল্পীরা। খুব সামান্য জিনিস দিয়ে এগুলো তৈরি হয়। আঠালো মাটি, কাগজের মণ্ড, পাতলা কাপড়, চকচকে করার জন্য গর্জন তেল, আঠা, ধুনো, পাট, নকল চুল, পাখির পালক, রাংতা, পুঁতি, শলমা-চুমকি ও রং ব্যবহার করা হয়।

## ঘরে বসে হাতের কাজ

স্যার বললেন— আমাদের রাজ্যে এরকম বহু মানুষ আছেন, যারা ঘরে বসে ছোটো ছোটো শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

বিশু বলল— আমি ফুলিয়ায় তাঁতিদের দেখেছি ঘরে বসে তাঁত চালিয়ে শাড়ি তৈরি করতে।

স্যার বললেন— বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর তো বিষ্ণুপুরী সিল্ক শাড়ির জন্য বিখ্যাত। আমার মায়ের আছে। তাতে বালুচরি কাজ করা। আর মুর্শিদাবাদেও সিল্কের শাড়ি তৈরি হয়।

শেফালি বলল--- শাড়ি তো হলো। কিন্তু গয়না! আমাদের রাজ্যে সোনা-রুপোর গয়না বানানো ছাড়াও সুতোর গয়না, পোড়ামাটির গয়না, কাঠের গয়নাও বানায় মানুষ।

— সোনা বা রুপো কী?

— এগুলো হলো ধাতু। এরকম কাঁসা-পিতল বা লোহাও ধাতু।

এসব ধাতু দিয়ে তৈরি তোমার চেনা জিনিসের নাম নীচে লেখো।

| জিনিসের নাম | কী ধাতু দিয়ে তৈরি |
|---|---|
| ১.আংটি, বালা, দুল | |
| ২.দা, কোদাল | |
| ৩.থালা, বাটি, গ্লাস | |

## ডোকরা

স্যার বললেন— পিতল দিয়ে তোমরা বাসনপত্র তৈরির কথা জানলে। আবার বাঁকুড়া ও বর্ধমানের মতো অনেক জেলায় কিছু লোক মৌ-মোম আর ধুনোর ছাঁচে গলানো পিতল ঢেলে নানান ধরনের মূর্তি তৈরি করেন। আমাদের বাড়িতে আছে এরকম এক পিতলের ময়ূর। পিতলের এসব জিনিসগুলোকে বলা হয় ডোকরা।

বিশু বলল— স্যার, ডোকরার পঞ্চপ্রদীপ, ময়ূর, গণেশ, জগন্নাথ, পেঁচা, কাজললতা, চাল মাপার কৌটো, সপরিবারে মা দুর্গার মূর্তি অনেক মেলায় দেখেছি।

সহেলি বলল--- যারা লোহার জিনিস তৈরি করেন তাঁদের তো কর্মকার বলে। ডোকরার কাজ করেন যাঁরা তাঁদের কী বলা হয়?

— এই পিতল-ঢালাই শিল্পীদের কোথাও মালাহার, কোথাও স্যাঁকরা বা কোথাও আবার ঢেপ্পো বলা হয়।

এরকম ধরনের নানা উপাদান দিয়ে জিনিস বানানো ছাড়াও কেউ কেউ অন্য কাজও করেন। মাটির সরা, কলশি বা হাঁড়ির গায়ে ছবি আঁকেন। কেউ বা দেয়াল ও মেঝেতে আল্পনার কাজ করেন। কেউ বা মিষ্টি বানান। আর ছোটো বড়ো নানা কারখানায় কাজ করে কত মানুষের সংসার চলে। কেউ বা মুড়ি ভাজেন আবার কেউ তৈরি করেন সিমেন্ট।

# কতরকম উপাদান

এ বছর পাড়ায় নতুন একটা চাউমিন তৈরির কারখানা হয়েছে। ওখানে বেশি ময়দা দিতে পারায় অসিতের বাবার মন বেশ খুশিখুশি।

দিদিমণি অসিতের কথা শুনে বললেন— এক একটা জিনিস তৈরির জন্য এক একরকম উপাদান লাগে। আর তা বিভিন্ন জায়গা থেকে জোগাড় করা হয়।

এসো এখন আমরা এরকম তোমার চেনা কিছু শিল্প আর তার প্রধান উপাদান জানার চেষ্টা করি।

| শিল্পে কী তৈরি করা হয় | কী উপাদান লাগে বলে তোমার মনে হয় |
|---|---|
| বিস্কুট, পাঁউরুটি, কেক | |
| জামাকাপড় | |
| বাড়ির বারান্দার গ্রিল | |
| দড়ি, বস্তা, ব্যাগ | |

সঞ্জয় বলল— কিন্তু শিল্পের এই উপাদানগুলো কোথা থেকে পাওয়া যায়?

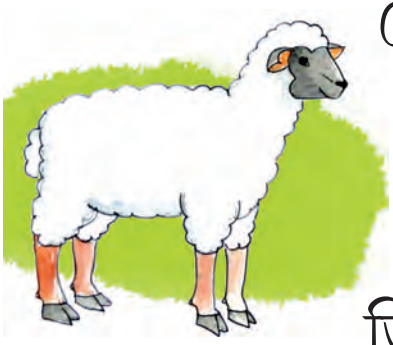

রীনা বলল— কাগজ তৈরির কাঠ আর বাঁশ পাওয়া যায় বন থেকে। আবার ডিম, দুধ, পশম আর রেশম এসব আসে পালিত প্রাণী থেকে।

তোমার এলাকায় যেসমস্ত শিল্প তোমরা দেখো, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে অথবা বড়োদের সাহায্য নিয়ে জানার চেষ্টা করো তার উপাদানগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়।

| শিল্পের নাম | উপাদান কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয় |
|---|---|
| ১. মিষ্টি বানানো | |
| ২. খেলনা তৈরি | |
| ৩. ঘর সাজানো | |
| ৪. বড়ো বড়ো বাড়ি তৈরি | |
| ৫. কাপড় বোনা | |

# কোনোটা বাড়িতে তৈরি, কোনোটা কারখানায়

এতরকম উপাদান থেকে যে কীভাবে কী করা হয়, সেটা ঠিক বুঝতে পারেনি অসিত, সঞ্জয়রা।

দিদিমণি বললেন--- এই উপাদানগুলো নিয়ে নানা ধাপে বদলানো হয়। এটা ওটা সঙ্গে মেশানো হয়। কখন বা আগুনে গরম করা হয়। ছোটো, বড়ো যন্ত্রপাতিও লাগে। কখন জিনিসটা দক্ষ কারিগররা হাতেই তৈরি করে নেন।

অসিত বলল— দিদি, সবই তো একরকম জিনিস নয়। আর সব জিনিস তো একই কারখানায় নিশ্চয়ই তৈরি হয় না।

দিদিমণি বললেন— ঠিক বলেছ। কোথাও কারখানা ছোটো। যন্ত্রপাতি আর লোকজনও লাগে কম। এগুলো হলো ছোটো বা **ক্ষুদ্র শিল্প**। বাড়ির মধ্যেই আরও কম জায়গায় এধরনের জিনিস তৈরি করা হলে, সেটা **কুটির শিল্প**।

সঞ্জয়ের বাড়িতে বসেই ধূপ বানানো বা চানাচুর তৈরি করতে দেখার অভিজ্ঞতা আছে। আর মলয়দের বাড়িতে জ্যাম, জেলি, আচার তৈরি হয়। অসিত বলল— তাহলে দিদি, তাঁতে কাপড় বোনা বা জরির কাজ এগুলোও ক্ষুদ্র শিল্প?

দিদিমণি পশ্চিমবঙ্গের একটা মানচিত্র দেখালেন। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলায় বা স্থানে ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে তা দেখিয়ে বোঝালেন।

| কী ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | পশ্চিমবঙ্গের কোথায় দেখা যায় |
|---|---|
| তাঁত শিল্প | হুগলির শ্রীরামপুর, ধনেখালি, নদিয়ার নবদ্বীপ, .....। |
| রেশম শিল্প | মালদার সুজাপুর, কালিয়াচক, মুর্শিদাবাদের .....। |
| মৃৎ শিল্প | কলকাতার কুমোরটুলি, ....., নদিয়ার কৃষ্ণনগর, ..... । |

| কী ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | পশ্চিমবঙ্গের কোথায় দেখা যায় |
|---|---|
| গালা শিল্প | পুরুলিয়ার ঝালদা, বাঁকুড়ার সোনামুখি, .....। |

তমাল এতক্ষণ মন দিয়ে সব কথা শুনছিল। এবার সে বলল— আমার মামার বাড়ি চিত্তরঞ্জনে। সেখানে তো কত বড়ো কারখানায় রেলইঞ্জিন তৈরি হয়।

দিদিমণি বললেন— বড়ো বড়ো কারখানায় অনেক লোক দিনরাত কাজ করে আর বড়ো বড়ো যন্ত্রপাতি দিয়ে কোনো জিনিস অনেক পরিমাণে তৈরি হলে সেগুলো হলো বড়ো শিল্প। জাহাজ তৈরি, মোটর গাড়ি তৈরি এরকমই বড়ো শিল্প। আমরা যে জামাকাপড় পরি অথবা রোজ ব্যবহার করি এমন জিনিসগুলোর অনেকগুলোই এরকম বড়ো কারখানায় তৈরি।

# না পড়ে শেখা নানা কাজ

স্কুল আজ ছুটি। তাই সুরজ খেলতে গেছে পাশের পাড়ার বিনোদদের বাড়িতে। সুরজ অবাক হয়ে দেখছিল, কী সুন্দর একটা পোড়ামাটির বুদ্ধমূর্তি রয়েছে বিনোদদের আলমারিতে। বাড়ি ফিরে তার খুব ইচ্ছে হলো মাটির কিছু বানায়। তাই একটা ঘোড়া তৈরি করে রোদ্দুরে শুকোতে দিল। পরের দিন রান্না শেষ করে, সুরজের মা কাঠের উনুনের মধ্যে সাবধানে পুড়তে দিলেন সেটা।

সুরজের মা দুপুরের পর উনুন থেকে পুতুলটা বের করে দিলেন। সুরজ দেখলো সেটা পুড়েছে বটে, কিন্তু ফেটে চৌচির।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে মিনা, কেতকী, রাহুলের সঙ্গে সুরজ কথাটা বলছিল। দিদিমণিও যোগ দিলেন তাদের কথায়।

সুরজ বলল— আচ্ছা দিদি, বিনোদের বাবা যে বুদ্ধ মূর্তিটা কিনেছেন সেটা তো পোড়ামাটির। আমার তৈরি ঘোড়াটা তাহলে পোড়াতে গিয়ে ফেটে গেল কেন?

দিদিমণি একটু হাসলেন। তারপর বললেন— তুমি কি জানো, বিনোদদের বাড়ির মূর্তিটা কেমন মাটি থেকে তৈরি? জানো না, তাইতো। মাটি পোড়ালেই হবে না। প্রথমে মাটি তৈরি করতে হবে, যাতে পোড়ালেও ফেটে না যায়।

কেতকী বলল — আমার দিদিমা মাটির পুতুল তৈরি করে পুড়িয়ে আমাকে খেলতে দেন। কই সেগুলো তো ফেটে যায় না?

— তার মানে তোমার দিদিমা জানেন, কোন মাটি কত তাপে কতক্ষণ ধরে পোড়ানো যায়। তুমি দিদিমার কাছ থেকে সেটা জানার চেষ্টা করো।

সুরজ বলল — আমি তাহলে কী করে জানব?

— তুমি জানবে কেতকীর কাছ থেকে। আবার তোমার কাছ থেকে জানবে অন্যরা।

মিনা বলল— সবাই তাহলে সব জিনিস তৈরি করতে জানে না; শিখলে তবেই পারবে? কিন্তু শিখবে কী করে?

—এই যে এতরকমের হাতের কাজ বা **শিল্পকর্ম**। এক একটা জায়গা এক একরকম শিল্পকর্মের জন্য বিখ্যাত। আর শুধু সেখানকার মানুষরাই জানেন তার পদ্ধতি। কোথাও লেখাজোখা থাকে না। **একজন অন্যজনকে হাতে ধরে কাজ শেখান**। এই যে পোড়ামাটির কাজ। বাঁকুড়ায় গেলে দেখবে কতরকম পোড়ামাটির জিনিস। কিন্তু ওই জিনিস তৈরি করতে গেলে কী কী মিশিয়ে মাটি তৈরি করতে হবে, কতটা পোড়াতে হবে এইসব বিষয় জানতে হবে।

সুরজ বলল — না হলে, ঠিকমতো হবে না।

— মাটি তৈরি না হলেও হবে না; আবার বেশি বা কম পুড়লেও চলবে না। যারা এই কাজটা করছেন, তাদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে যে সবটাই তাঁরা হাতেকলমে শিখেছেন।

রাহুল বলল— আমাদের বাড়িতে যখন খাটের গায়ে নকশা করছিলেন মোহনজেঠু, তখন দেখেছি কতরকম যন্ত্রপাতি তাঁর। আর হাতুড়ি মারার জোরও কখন কম, কখন বেশি।

— রাহুলের মতো তোমরাও লক্ষ করলে দেখবে যারা কাঠ বা পাথর খোদাইয়ের কাজ করেন, তাদের কাজ করার পদ্ধতি অন্যরকম। সোজা বা বাঁকা, তীক্ষ্ণ বা চওড়া — কতরকম যন্ত্র লাগে।

কেতকী বলল— শুনেছি ডোকরার পুতুল, পেতলের বাতিল অংশ বা অন্য ধাতু গলিয়ে অথবা ব্রোঞ্জ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।

— কিন্তু কেতকী, তুমি নিশ্চয়ই এটা লক্ষ করোনি যে দুটো একেবারে একইরকম জিনিস নেই সেখানে।

—ঠিক দেখিনি তো! এরকম কেন হয় দিদি?

— ওই জিনিসগুলো তৈরির সময় প্রথমে জিনিসটার একটা ছাঁচ বানাতে হয়। এক একটা জায়গায় ছাঁচের আদল এক একরকম। আবার হাতে বানানো বলে একটার সঙ্গে অন্যটার মিল নেই। বংশানুক্রমে ওখানকার মানুষ শিখেছে কীভাবে এই ছাঁচ তৈরি করতে হয়, কীভাবে ধাতু গলাতে হয়, তারপর সেই ছাঁচে ঢেলে মূর্তি বানাতে হয়। শেষে ছাঁচ ভেঙে ওই মূর্তি বের করা হয়।

— ও, তাহলে একটা ছাঁচ একবারই ব্যবহার করা যায়। সেজন্যেই সব আলাদা দেখতে হয় ডোকরার পুতুলগুলো।

— তারপর সেগুলোকে ঘষামাজা করলে তবেই বিক্রির উপযুক্ত হয়।

যে সমস্ত অলিখিত জ্ঞানের কথা জানলে পরের পাতায় লিখে ফেলো

| কী কাজ করতে লাগে | কী কী বিষয়ের জ্ঞানের প্রয়োজন |
|---|---|
| ১. | |
| ২. | |
| ৩. | |

দিদিমণি বললেন--- তাহলে দেখো, হাতেকলমে কাজগুলো যদি শেখা না থাকে, তাহলে সেগুলো করাও যাবে না। বই পড়েও করা সম্ভব নয়।

রাহুল বলল— আমরা সিকিমে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন দেখেছি বেতের টেবিল—চেয়ার, আলোর স্ট্যান্ড — আরও কত কিছু।

— বেতের জিনিস তৈরি করতে গেলে বেতকে বাঁকাতে হয়, বেত জুড়তে হয়, পালিশ করতে হয়। সবরকম বেত বাঁকবেও না; কত মোটা বেত কতটা বাঁকবে সেটা চিনতে হবে। কোনো কাজে বেতের শুধু ছালটা লাগবে, না অন্য

অংশ লাগবে তাও জানতে হবে। কখনো- কখনো কাঁচা বেতকে আগুনে গরম করে বাঁকাতে হয়। কতটা তাপ লাগবে? তা না জানলে বেশি তাপে বেতটা পুড়েই যাবে।

— তার মানে এই কাজটাও শিখতে হবে। যাঁরা কাজটা করেন তাদের কাছ থেকে সরাসরি শিখতে হবে।

তোমার এলাকায় নীচের কাজগুলোর কোনোটা হয় কী? তার সম্বন্ধে নীচের তথ্যগুলো পূরণ করো :

| কী ধরনের কাজ | যিনি করছেন তার পরিবারের অন্য কেউ কাজটা করেন / করতেন কিনা | তিনি কাজটা কার কাছ থেকে শিখেছেন |
|---|---|---|
| (১) কাঠের কাজ | | |
| (২) মাটির কাজ | | |

| কী ধরনের কাজ | যিনি করছেন তার পরিবারের অন্য কেউ কাজটা করেন / করতেন কিনা | তিনি কাজটা কার কাছ থেকে শিখেছেন |
|---|---|---|
| (৩) নরম পুতুল তৈরির কাজ | | |
| (৪) যে-কোনো রকম গয়না তৈরির কাজ | | |
| (৫) শাড়ির পাড়ের নকশা বোনা | | |

—আমার মা ভালো আলপনা দিতে পারেন। আমরা লালমাটির দেশের মানুষ। সেখানে বনের কাছাকাছি যেসব মানুষ থাকেন, তাঁদের মাটির বাড়ির দেয়ালে দেখেছি আলপনার মতো বিভিন্ন ছবি আঁকা।

— এসব নকশা তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টি। তাই অন্য কোথাও দেখতে পাবে না। আবার যারা পটচিত্র আকেন তাঁরা একরকম রং ব্যবহার করেন। সেই রং কী থেকে পাওয়া

যাবে, শুধুমাত্র তাঁরাই জানেন। কোন জিনিস রং করতে কী রং ব্যবহার করা হবে, সেটাও শুধু হাতেকলমে শিখে নেন ভবিষ্যতের শিল্পীরা।

— সেজন্যই ওই পটে আঁকা ছবিগুলো একটু অন্যরকম। তাদের রংগুলোও ঠিক সাধারণ রঙের মতো নয়।

— এখন ভেবে দ্যাখো, যদি কেউ এভাবে কাজগুলো শিখে না রাখেন, তাহলে কী হবে?

— সেই জিনিসটাই আর তৈরি হবে না।

— শিল্পটাই হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো।

সুরজ বলল— আমাদের বাড়িতে একটা শিং-এর তৈরি বক আছে। যার মধ্যে দিয়ে আলো যেতে পারে। তার মুখে আবার একটা চিংড়ি মাছ আছে। আচ্ছা দিদি, এরকম জিনিস তো এখন আর খুব একটা চোখে পড়ে না?

—তাহলে নিশ্চয়ই খুব কম লোকই এখন এই জিনিস তৈরির কাজটা জানে। তাই বেশি জিনিস তৈরি হয় না, আর তুমি দেখতেও পাও না।

# দিনের শেষে গল্পগাথা

ছন্দার বাড়িতে দিদিমা এলে ওর খুব আনন্দ হয়। সন্ধেবেলায় বাবা জ্যেঠুরা কাজের জায়গা থেকে ফিরে

আসেন। অনেকে মিলে একসঙ্গে গল্প করতে বসে। ছন্দাও দিদিমার কাছে নানা গল্প শোনার বায়না করে। আর দিদিমাও মনের আনন্দে নানা গল্প শোনায়। সেই গল্পে থাকে অপূর্ব রাজপুত্র, কোটালপুত্র, রাজকন্যা আর দৈত্য-দানব। আবার কোনো কোনো গল্পে থাকে নানা পশু-পাখি। চালাক শেয়ালের গল্প, খরগোশ ও কচ্ছপের গল্প, বোকা হাতির গল্প, সিংহ ও চালাক ইঁদুরের গল্প ছন্দা দিদিমার কাছে শোনে আর অবাক হয়ে যায়। রাজপুত্র ও রাজকন্যার গল্পে লড়াই থাকে। দৈত্য-দানবের সঙ্গে লড়াইয়ে খুব কষ্ট করে হলেও জেতে রাজপুত্র -রাজকন্যারা। এগুলো কোথাও লেখা ছিল না। মুখে মুখে মানুষ শুনেছে আর দিদিমাদের মতো করে ছোটোদের বলেছে। তোমাদের মনে আছে রাখাল বালক আর বাঘের কথা? সেই যে রাখাল বালক মাঠে গোরু চরাত। মাঝে মাঝে মজা করে মিথ্যে মিথ্যে পালে বাঘ পড়েছে বলে চিৎকার করত। সেই চিৎকার শুনে আশপাশ থেকে মানুষ

ছুটে আসত। রাখাল বালককে বাঁচানোর জন্য। আর তাই দেখে রাখাল খুব হাসত। একদিন সত্যি সত্যি পালে বাঘ পড়ল। রাখাল বালক খুব চিৎকার করল কিন্তু কেউ এল না। আর এই রকম নানা গল্প বলে দাদু-ঠাকুমারা আমাদের নানা উপদেশ দেন। যা আমাদের ভালোভাবে বাঁচতে সাহায্য করে। তোমরাই বলো রাখালের গল্পে আমরা কী শিখলাম? এরকম ভাবেই লোকমুখে নানা গল্প আমরা শুনি। যা আমাদের জীবনে কাজে লাগে। এগুলো সবই লোককথা।

## নানা ধরনের লোকগান

শঙ্কুরা দল বেঁধে গেছিল শান্তিনিকেতন পৌষমেলায়; বাবা, মা, দিদি সবাই কেনাকাটা খাওয়াদাওয়া করতে করতে একটি জায়গায় গিয়ে শঙ্কু দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে একটি মঞ্চ– অনেক মানুষ বসে আছে গোল করে। আর একেক জন করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাইছে। অনেকে বাজাচ্ছে। শঙ্কুর খুব মনে ধরল ব্যাপারটা।

শঙ্কু তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল— এরা কী গান গাইছে বাবা? এরা কারা?

বাবা বললেন— এঁরা বাউল, বাউল গান গান।

শঙ্কু বলল— বাউল গান মানে রবীন্দ্রনাথের গান?

বাবা বললেন— না, এই গান পল্লির গান, গ্রামের মানুষেরা গায়। পল্লির গান হলো সমাজের আদি গান।

বাবার ফোন এসে গেল।

শঙ্কুর আর এ বিষয়ে কথা বলা হলো না। কিন্তু মাথার মধ্যে গানটা ঘুরতে লাগল—

‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় / তারে ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম পাখির পায়’। গানটা শঙ্কু আগেও দু-একবার রেডিয়োতে শুনেছে। ফিরে এসে একদিন ক্লাসে দিদিমণিকে বলল তার পৌষমেলায় বাউল গান শোনার গল্প।

শঙ্কু দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করল— সেই ‘খাঁচার ভিতর’ গানটি নিয়ে।

দিদিমণি বললেন— এই গানটি লালন ফকিরের। তিনি ছিলেন বাংলার এক মহান সাধক বাউল। যাঁর কাছে আল্লা-হরি-রাম-রহিমের আসন ছিল সমান। যিনি মানুষে মানুষে মিলনের বাণী প্রচার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কথা বলেছেন, লিখেছেন।

রিনি জিজ্ঞেস করল— আর কী কী গান আছে আমাদের?

দিদি বললেন— সে তো অনেক। যদি একদম শুরুর কথা ধরো, যখন মানুষ একসঙ্গে জোট বেঁধে থাকত, শিকার করত, তখনও তো তার গান ছিল। নানা রকম কাজের কষ্টকে কমানোর জন্য তারা একসঙ্গে কাজের মধ্যে বা কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান গাইত।

হবিবুর বলল— কিছুদিন আগে আমাদের বাড়ির সামনে কিছু লোক মাটি খুঁড়ে নলকূপ বসাচ্ছিল আর তালে তালে সুর করে কী যেন সব গাইছিল।

দিদিমণি বললেন— ঠিক তাই।

রিনি বলল— ওর মামার বাড়িতে এখনও ধান ঝাড়া, ধান ভাঙার সময় বাড়ির মেয়েরা গান করেন।

দিদিমণি বললেন— নৌকা চালানো, তারপর ছাদপেটা, মাছধরা এইসব কাজগুলোর সঙ্গেই গান আছে। এগুলোকে বলে সারিগান।

জয় বলল— ওদের গ্রামে প্রত্যেক ভাদ্র মাসে ভাদু পুজো হয় আর তার সঙ্গে সারামাস ধরে গান চলতে থাকে।

বিদ্যাধর বলল— তাদের গ্রামে পৌষমাসে টুসু পরব আর টুসু গানের কথা।

তোমরা বাড়িতে বড়োদের কাছে জিজ্ঞেস কোরো তারা এরকম অনেক গানের হদিস দিতে পারেন তোমাদের।

# নানা জেলার নানা নাচ

স্কুল থেকে দল বেঁধে সবাই গেল মেলা দেখতে। মেলার মাঠে একটি খোলা জায়গায় গোল করে ভিড় জমেছে। আর শোনা যাচ্ছে বাজনার জোর আওয়াজ। এগোতেই দেখা গেল সেখানে মুখোশ পরে একদল নাচছে। লম্ফ-ঝম্ফ করে সবাই নাচছে।

দিদিমণি— জানো এটা কী নাচ? একে বলা হয় ছৌ-নাচ।

পরদিন ক্লাসে বসে সেই নাচ নিয়েই শুরু হলো কথা।

দিদিমণি— বাংলার আর কোনো নাচের কথা জানো তোমরা কেউ?

শঙ্কু — আমি তো পৌষমেলায় দেখেছিলাম বাউলরা গান গাইতে গাইতে নাচছে।

দিদিমণি— ঠিক। যদিও সব বাউলের নাচ একরকম নয় তবু বাউল গানের সঙ্গে নাচেরও কিছু নির্দিষ্ট মুদ্রা, ভঙ্গি

ও পা চালানোর রীতি আছে। যদিও আজকাল সেগুলো অনেকেই করে না।

মাধবী উত্তরবঙ্গের চা বাগান ঘুরতে গিয়ে দেখেছিল আদিবাসী শ্রমিকদের নাচ।

তা শুনে দিদি বললেন--- উত্তরবঙ্গে মেচ-রাভাদের অসাধারণ সব নাচ আছে।

বিদ্যাধরের আদি বাড়ি পুরুলিয়ায়। সেখানে বছরে দু বার করে যায় এখনও।

বিদ্যাধর--- ঝুমুর নাচের কথা। আদিবাসী মেয়েরা, সাঁওতাল মেয়েরা হাতে হাত ধরে ঝুমুর গাইতে গাইতে নাচ করে, সেই নাচের রয়েছে এক বিশেষ নমুনা।

দিদিমণি--- এ শুধু পুরুলিয়া নয়, বীরভূম, বাঁকুড়া,

মেদিনীপুর মানে পুরো রাঢ়বঙ্গ জুড়েই এই নাচের প্রচলন।

মহেশ— আমি মালদায় মামার বাড়িতে 'গম্ভীরা' পালা দেখেছি। ওই পালাতেও লোকে নাচে। আসলে লোকসংগীত বা বিভিন্ন লোকপালায় নাচটা এমনি জুড়ে যায়। গান-বাজনার সঙ্গে। গান-বাজনা-নাচ মিলিয়েই পুরো পরিবেশটা তৈরি হয়।

তোমাদের জানা, পড়া নানা গল্প নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো। তারপর নীচে লিখে ফেলো।

| তোমার জানা গল্প | গল্প থেকে কী শেখা যায় |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| লোকগানের প্রথম লাইন | কী উপলক্ষে গাওয়া | গানটি কোথায় শুনেছ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

তোমার অঞ্চলে বিভিন্ন উৎসবে / মেলায় কী কী ধরনের নাচ হয় তা লেখো।

| উৎসব/মেলার নাম | নাচের নাম |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

# সেকালের ছবি

পরদিন ক্লাসে সুমি জিজ্ঞাসা করল— দাদু বলছিলেন আগে মানুষ দেয়ালেই ছবি আঁকত। আচ্ছা দিদি মানুষ কবে থেকে ছবি আঁকতে শিখল?

দিদিমণি বললেন— বহুবছর আগে আদিম মানুষেরা পাহাড়ের গুহার দেয়ালে, ছাদে নানা ছবি আঁকত। কাঠকয়লার কালি, জন্তুজানোয়ারদের চর্বি মেশানো মাটি দিয়ে ছবি আঁকত।

জামান জিজ্ঞাসা করল— দিদি সেসময় মানুষ কীসের ছবি আঁকত?

দিদিমণি বললেন— তোমাদের মতোই গাছপালা, প্রকৃতি বা মানুষের ছবি আঁকত। সেই সঙ্গে জন্তুজানোয়ারদের ছবি, মানুষের শিকার করার ছবি আঁকত। যাতে তারা পরে

ভালোভাবে শিকার করতে পারে। তাই গুহার দেয়ালে বাইসন, বল্গা হরিণ, ভালুক এরকম নানা জীবজন্তুর ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

রতন বলল— দিদি গুহার ভেতরে তো খুব অন্ধকার। তারা তাহলে কীভাবে ছবি আঁকত?

— গুহার ভেতরে ওরা কাঠ, খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালাত। পরে জন্তুজানোয়ারদের চর্বি জ্বালিয়ে গুহা আলোকিত করত। তবে আদিম মানুষেরা শুধু গুহায় ছবি আঁকত না। উটপাখির ডিমের খোলাতেও নানা আঁকিবুঁকির কাজ পাওয়া গেছে। তবে তাদের সেই সময়ের ছবি আজও রয়ে গেছে। আদিম যুগের অনেক পরেও, মানুষ গুহার দেয়ালে ছবি এঁকেছিল। আমাদের দেশের অজন্তা গুহার দেয়ালে অনেক ছবি পাওয়া গেছে। সেইসব ছবিতে সাধারণ মানুষের রোজকার জীবনের নানা ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

# নানা ছবির কথা

সেসময় মানুষ শুধু শিকার ধরার জন্য ছবি আঁকত না। ভালোলাগা থেকেও ছবি আঁকত। মানুষ মাটির পাত্র বানাতে শিখল। পরে সেগুলোকে ঘষে পালিশ করে চকচকে করতে শিখল। তারপর তার গায়ে নানা ধরনের নকশা বা কারুকাজ ফুটিয়ে তুলল। তোমরা একটা মাটির ঘট জোগাড় করো। তার গায়ে তোমাদের মনের মতো করে নকশা বা ছবি আঁকো। আমরা আমাদের নানা

উৎসবে রং-বেরঙের আলপনা দিই। মাটির বাড়ির দেয়ালে নানা রঙের আলপনা বা নকশা দিয়ে সাজানো হয়।

তোমরা ছবি আঁকার সময় কী করো তা মনে করে নীচে লেখো।

| কী ধরনের ছবি আঁকতে বেশি পছন্দ করো | তোমার পছন্দের রং কী | ছবি আঁকতে কী কী জিনিস ব্যবহার করো |
|---|---|---|
| | | |

বাড়িতে বা স্কুলে তোমরা কোন কোন উৎসবে আলপনা দিতে দেখো। নীচে পছন্দমতো একটা আলপনা আঁকো।

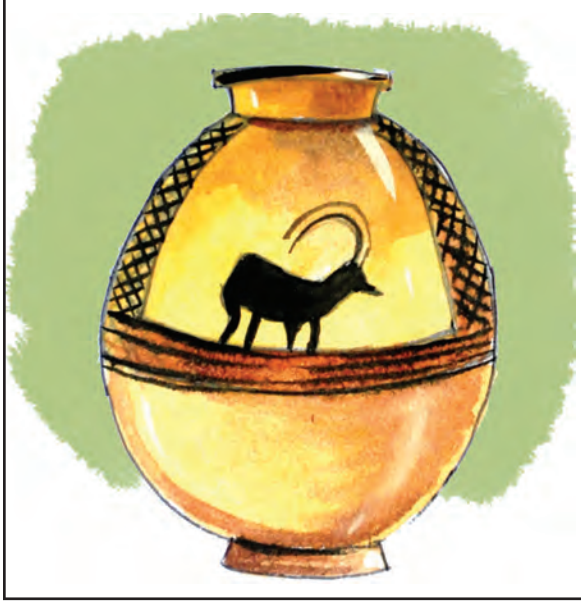

# মানুষের কত রকম সম্পর্ক

(১)

(২)

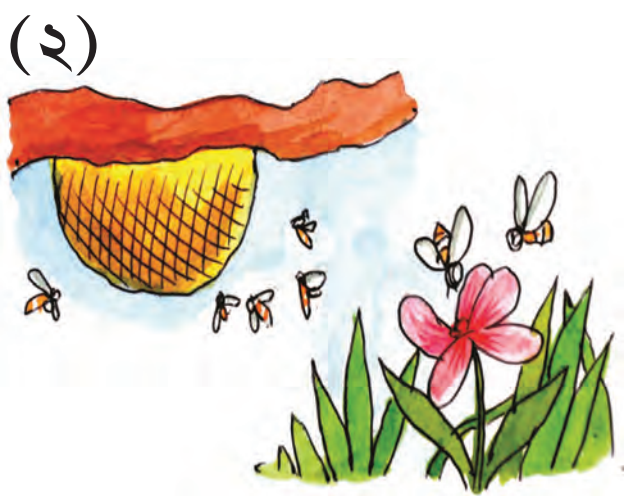

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

ওপরের ছবিগুলো দেখো। কোন ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছো? নীচে লেখো।

১. _____

২. _____

৩. _____

৪. _____

৫. _____

৬. _____

টিয়ার দাদা ওর পাশে বসেই একটা বই পড়ছিল। টিয়া একবার উঁকি দিল। দেখল দাদার বইতে একটাও ছবি

নেই! ছবি ছাড়া বই টিয়ার ভালোই লাগে না। দাদার বইতে লেখা মানুষ সামাজিক প্রাণী। টিয়া ভাবল, সামাজিক প্রাণী আবার কাকে বলে? ঠিক করল, পরদিন দিদিমণির কাছে জানতে চাইবে এর মানেটা।

পরদিন ক্লাসে দিদিমণি ঢোকা মাত্রই টিয়া প্রশ্ন করল — দিদি, সামাজিক প্রাণী মানে কী?

দিদিমণি বললেন — আসলে মানুষ সমাজে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। একা একা কোনো মানুষই থাকতে পারে না। দলবেঁধে সমাজে থাকে বলেই মানুষকে সামাজিক প্রাণী বলে। হাতি, মৌমাছি আর শিম্পাঞ্জিও একরকম সামাজিক প্রাণী।

পলাশ বলল— পিঁপড়ে, উইপোকারাও তো দল বেঁধে থাকে। ওরাও কি সামাজিক প্রাণী?

— হ্যাঁ। কিন্তু মানুষের সমাজ সেসবের থেকে আলাদা।

রমেশ বলল — দিদি, সমাজ মানে কী দলবেঁধে থাকা?

— সমাজ কথার একরকম মানে হতে পারে একসঙ্গে চলা। সকলের প্রয়োজন সকলে মিলে মেটানো। একের দরকারে সকলের সাহায্য করা।

রাবেয়া বলল — পরিবারেও তো তাই হয় দিদি। সবাই সবার পাশে দাঁড়ায়।

দিদিমণি বললেন— হ্যাঁ। সমাজ ও পরিবারের অনেক মিল আছে।

রানি বলল— দিদি ঠাকুমা একবার একটা কথা বলেছিল —আমাদের অনেক আত্মীয়। আত্মীয় মানে কী দিদি?

— একই পরিবারের শাখা-প্রশাখাকে একসঙ্গে আত্মীয় বলে। আমরা সবাই এক একটা পরিবারে থাকি। ধরো, তোমার পরিবারে ঠাকুরদাদারা পাঁচ ভাই চার বোন। সেই

চার বোনের আলাদা পরিবার। আবার তোমার ঠাকুমার তিন ভাই। তাঁদেরও আলাদা পরিবার। সেইসব মানুষেরা তোমাদের সঙ্গে একই পরিবারে থাকেন না। কিন্তু তারা সবাই মিলে তোমাদের আত্মীয়।

রহমান বলল— সেভাবে দেখলে তো আমাদের আত্মীয় মানে অনেক মানুষ!

— হ্যাঁ, তাইতো যতদিন গেছে তত লোক বেড়েছে। আর সম্পর্কগুলো তত ছড়িয়ে পড়েছে।

পলাশ বলল— দিদি সমাজ কী?

—অনেক মানুষ একটা জায়গায় একসঙ্গে থাকেন। তারা একে অন্যকে নানাভাবে সাহায্য করেন। সেই মিলেমিশে থাকার ফলে মনে হয় যেন একটা বড়ো পরিবার। অথচ সেটা পরিবার নয়। আবার সকলে আত্মীয়ও নয়। যেমন, ডাক্তারকাকু রানির বা রহমানের পরিবারের মানুষ নন।

অথচ তিনি তোমাদের খেয়াল রাখেন। তোমরা তাঁর বাড়িতে যাও। একইভাবে তোমরা যারা এই ক্লাসে পড়ো, সবাই একই পরিবারের নও। হয়তো আত্মীয়ও নও। তবু কেমন মিলেমিশে থাকো। এইরকম মিলেমিশে একসঙ্গে থাকা থেকেই সমাজ তৈরি হয়। সমাজ যদিও পরিবারের থেকে বড়ো।

অরুণ বলল— দিদি সমাজ কি মানুষই তৈরি করেছে?

— হ্যাঁ। একসময় মানুষ একজোট হয়ে থাকত। তাতে খাবার খুঁজতে সুবিধা হতো। আবার বন্য পশুর সঙ্গে লড়তেও সুবিধা হতো। তখন মানুষ বুঝল একা থাকার থেকে জোট বেঁধে থাকার সুবিধা বেশি। জোট বাঁধা থেকেই একসময়ে পরিবার আর সমাজ তৈরি হলো। সমাজে নানা লোক নানা কাজ করেন। সেখানে একজন আরেকজনের উপর নির্ভর করে থাকে। ধরো একজন চাষ করেন। তার ফলানো ফসল বাকিরা খান। আবার একজন কাপড় তৈরি করেন।

তাঁর তৈরি করা কাপড় সবাই পরেন। একজনই সব কাজ করেন না বা করতে পারেন না।

এবার দিদিমণি জানতে চাইলেন— বাড়িতে তোমাদের সঙ্গে আর কে কে থাকেন?

সবাইয়ের কথা থেকে বোঝা গেল অধিকাংশেরই বাড়িতে বাবা-মা বা ভাই-বোন আছে। কারো কারো বাড়িতে দাদু-ঠাকুমা আছেন। অনেকের বাড়িতে আবার জেঠু-জেঠিমা, কাকা-কাকিমা, মামা-মামিমাও থাকেন। আবার তাদের ছেলে-মেয়েরাও থাকে।

ওমর বলল- কয়েকদিন আগে আমাদের বাড়িতে হঠাৎ জলের কল খারাপ হয়ে গেল। সারিয়ে দিয়ে গেল পাশের পাড়ার হরিকাকা।

মাধুরীর মা একবার খুব অসুস্থ হয়েছিলেন। ডাক্তারকাকু একটা ওষুধ লিখে দিলেন। পাড়ার কোনো দোকানে

পাওয়া গেল না। শ্রাবণীর বাবা শহরে সরকারি অফিসে চাকরি করতে যান। উনি শহর থেকে ওষুধটা এনে দিলেন। দিদিমণি বললেন— তোমরা বুঝতে পারলে তো আমরা একা একা কেউ বাঁচতে পারব না। অনেক দিন আগেই মানুষ তা বুঝতে পেরেছিল। আর তাই তারা একসঙ্গে থাকত। যা পেত সবাই ভাগ করে খেত।

পলাশ বলল — দিদি, আমরা তো বন্ধুরা ভাগ করেই খাই। বাড়িতেও সবাই ভাগ করেই খাই।

রাবেয়া বলল — আবার অনেকের সঙ্গে বসেও খাই।

রাজু বলল — হ্যাঁ, দিদি। সেদিন আমাদের পাড়ায় সবাই একসঙ্গে খেলাম। সারাদিন খুব মজা করে কাটল। বড়োরা রান্না করল। খেতে দিল। আমরা নুন, জল, লেবু আর পাতা দিলাম।

নানা মানুষ তোমাকে নানা কাজে সাহায্য করেন।

ওমর বলল— জবার ভাই চোখে ভালো করে দেখতে পায় না। ওর কি তাহলে বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন?

দিদিমণি বললেন— আমাদের সমাজে এরকম অনেকেই আছে যারা জন্ম থেকে চোখে দেখতে পায় না, কানে শুনতে পায় না, ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারে না। আবার রোগে আক্রান্ত হয়ে বা দুর্ঘটনার কবলে পড়লেও অনেকের নানা অঙ্গের মারাত্মক ক্ষতি হয়। বয়স হলেও মানুষ তার নানা অঙ্গের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাদের সকলেরই বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন। অবশ্য এদের সব কাজে সাহায্যের দরকার হয় না। এমনকি এরাও পরিবারে ও সমাজে নানা কাজে সাহায্য করে।

নীচের ফাঁকা স্থান পূর্ণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করো।

| সঠিকভাবে বা একদমই কাজ করতে পারে না মানবদেহের এমন অঙ্গের নাম | প্রধান অসুবিধা | যার এই অসুবিধা আছে সে বন্ধুদের থেকে কী কী সহযোগিতা পেতে পারে | যার এই অসুবিধা আছে সে তার বন্ধুদের কী কী সহযোগিতা করতে পারে |
|---|---|---|---|
| চোখ | দেখতে না পাওয়া বা কম দেখা | বল খেলার সময় শব্দ-ওয়ালা বল নিয়ে খেলা, কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা, যাওয়ার রাস্তা উঁচু-নীচু, গর্ত থাকলে তা বলে দেওয়া,..... | গল্প বলতে পারে, পড়া বুঝিয়ে দিতে পারে, গান, নাটক,আবৃত্তি করতে পারে, টিউবওয়েল পাম্প করতে পারে,..... |
| কান | শুনতে না পাওয়া বা কম শোনা | ক্লাসরুমে সামনের বেঞ্চে বসতে দেওয়া, যতটা সম্ভব জোরে কথা বলে তাকে বুঝতে সাহায্য করা, ..... | যাদের দেখতে অসুবিধা হয় তাকে চলাফেরা করতে সাহায্য করতে পারে, বন্ধুদের খেলায় সাহায্য করতে পারে, ..... |
| জিহ্বা | | | |
| পা ও হাত | | | |

এবার তোমরা তোমাদের চারপাশের সমাজকে খুঁটিয়ে দেখো। সেই সমাজে কে কীভাবে তোমাদের সাহায্য করেন তা দেখো। তোমরা অন্যদের কীভাবে সাহায্য করো তাও ভাবো। তারপর লিখে ফেলো:

| তোমার প্রয়োজন | কে এই প্রয়োজন মেটান | প্রয়োজন না মিটলে কী কী অসুবিধা হয় | কে এই প্রয়োজন মেটান | তোমার বাড়ির প্রয়োজন |
|---|---|---|---|---|
| খাবার | চাষি | ঘরবাড়ি | ঘরামি/ রাজমিস্ত্রি | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# বিভিন্ন ধরনের সমাজ

রাবেয়া বলল — আমরা সবাই তাহলে সামাজিক জীব। কিন্তু, দিদি, সমাজ চালায় কারা?

দিদিমণি বললেন --- সমাজ চালায় সেই সমাজের সমস্ত মানুষ মিলে। তবে সবসময় সমাজ একইরকম ছিল না কিন্তু।

পলাশ বলল — সমাজেরও আবার নানারকম ভাগ হয় না কি, দিদি?

দিদিমণি বললেন — হ্যাঁ। তা হয় বইকি। ধরো, আমি যদি তোমাদের পুরো নাম জানতে চাই। তোমরা নাম ও পদবি বলবে। তোমার পদবি আর তোমার বাবার পদবি একই। তার মানে তোমার নামের পাশে বাবার পদবি জোড়া হয়। সেই পদবিটাই তোমাদের পরিবারের পদবি। কিন্তু, তোমার মায়ের পদবি আগে আলাদা ছিল।

তোমাদের পরিবারে এসে তিনি তোমার বাবার পদবি ব্যবহার করেন।

অরুণ বলল — দিদি, পদবির সঙ্গে সমাজের কী সম্পর্ক?

দিদিমণি বললেন — এই যে বললাম, নানারকম সমাজের কথা।

তোমরা অনেকে বাবার পদবি নামের পাশে লেখো। আবার অনেকের
আছে জায়গার নামে পদবি।

সুমনা বলল— তাহলে সমাজে মেয়েদের ভূমিকা কী?

দিদিমণি বললেন — আমাদের সমাজে ছেলেমেয়ের ভূমিকা সমান। সে অনেকদিন আগেকার কথা। সবাই দলবেঁধে থাকত। মেয়েরাও শিকারে যেত ছেলেদের সঙ্গে। আবার তারা বাচ্চাদের দেখাশোনাও করত।

পলাশ বলল — আমার মাও চাকরি করেন। আবার বাড়ির কাজও করেন। বাবাও মাকে সাহায্য করেন বাড়ির কাজে। তবে আমাদের বাড়িতে ঠাকুমাই এখন সবার বড়ো, সকলে তাঁর কথা মানেন।

দিদিমণি বললেন — আমাদের দেশের মেঘালয় রাজ্যে খাসিয়াদের সমাজে আজও মা পরিবারের প্রধান। সেই সমাজে মায়ের গুরুত্ব বেশি। পরিবারের প্রধান বলতে মা। তার আদেশই শেষ কথা। সম্পত্তির ওপর পুরুষদের কোনো অধিকার নেই। মায়ের বংশ পরিচয়েই সন্তানের বংশপরিচয়। আমাদের সমাজের কথা বলতে গেলে আমরা বলি আদিপুরুষের কথা। আর খাসিয়ারা বলে আদিমাতার কথা।

রানি বলল— আচ্ছা দিদি সমাজ চিনব কী করে?

— অনেকদিন এক জায়গায় একসঙ্গে থাকার ফলে সমাজ তৈরি হয়। তাই সেই সমাজে লোকেরা কতকগুলো বিষয়ে একইরকম হয়। ধরো সংস্কৃতির কথা। আমরা প্রায় সবাই ক্লাসে একইরকম সংস্কৃতি নিয়ে থাকি। ভাষা, খাবার, পোশাক, নাচ, গান, উৎসব আর শিল্পকলা নিয়েই সংস্কৃতি। আর তা দিয়ে চেনা যায় এক একটা সমাজকে।

# এবার ছবিগুলো থেকে কী কী বোঝা যাচ্ছে বলো।

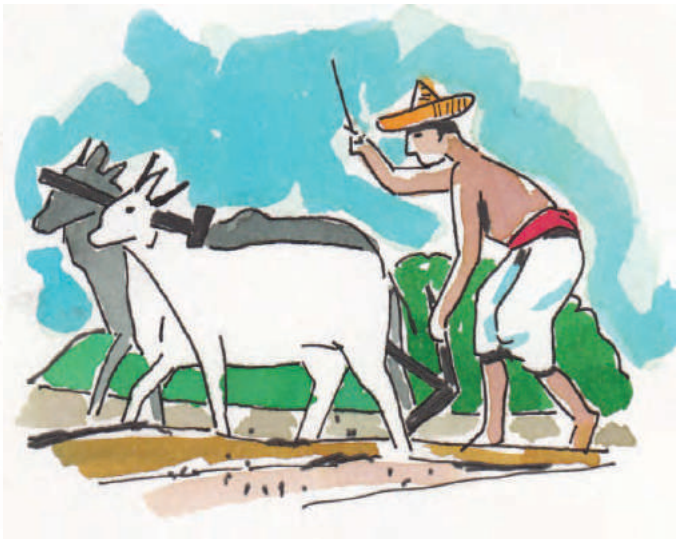

রাবেয়া বলল — দিদি, নানারকম কাজ করছে সবাই।

পলাশ বলল — পুরুষ ও মহিলা দুজনেই একই কাজ করতে পারে।

দিদিমণি বললেন — এর থেকেও একরকম সমাজের কথা জানা যায়। ধরো, একসময় মানুষ শুধু ঘুরে ঘুরে খাবার খুঁজে বেড়াত। তাকে যাযাবর সমাজ বলা হয়।

রানি বলল — তারপর কি পশুপালন করতে শিখল?

— হ্যাঁ। তখন পশুপালক সমাজ হলো। এরপর চাষ করতে শিখল মানুষ। তখন কৃষিসমাজ তৈরি হলো। সমাজের বেশিরভাগ মানুষই তখন কৃষির কাজ করত।

বিশু বলল — তখনও কারখানা হয়নি দিদি?

— না। প্রথমে ঘরোয়া কাজ দিয়েই শিল্পের কাজ শুরু হলো। তারপর একসময় কারখানা হলো। সে বেশিদিন আগের কথা নয়। তখন ওইসব বড়ো বড়ো কলকারখানায় চাষের বদলে অনেকে কাজ করতে লাগলেন।

শিবু বলল — ওই সমাজকে কি তাহলে শিল্প-সমাজ বলা যাবে?

দিদিমণি বললেন — হ্যাঁ। কিন্তু শুধু শিল্প-সমাজ হলে চলে না। খেতে-পরতে হবে তো। তাই কৃষি ও শিল্প পাশাপাশি চলতে থাকল। আজকের সমাজেও তাই কেউ চাষ করেন। কেউবা কারখানায় কাজ করেন। এছাড়াও অনেক পেশা আছে। নানারকম পেশার মানুষ নিয়েই আমাদের সমাজ।

এবার তোমরা তোমাদের চারপাশের সমাজ খুঁটিয়ে দেখো। তারপর নীচে আলোচনা করে লিখে ফেলো:

| আমাদের সমাজে কতরকম ভাষায় মানুষ কথা বলেন | আমাদের সমাজে বিভিন্ন মানুষ কী কী ধরনের পোশাক পরেন | আমাদের সমাজে বিভিন্ন মানুষ কী কী উৎসব পালন করেন | আমাদের সমাজে পুরুষ ও মহিলারা কী কী জীবিকায় যুক্ত | আমাদের সমাজে বিভিন্ন মানুষ কী কী খাবার খান |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

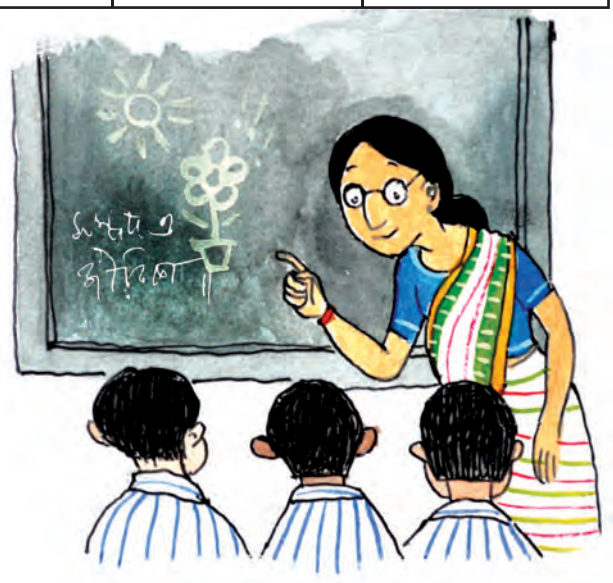

# চাষের সেকাল একাল

এবার তোমরা নিজেদের মধ্যে বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে ওপরের ছবিগুলোর কোনটি কী ধরনের ফসল তা নীচে লিখে ফেলো।

| দানা শস্য | ডাল শস্য | তন্তু | ফল | পানীয় | সবজি | তেল | ফুল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |